নজরুলের জীবনে নার্গিস

এম এ ওয়াহিদ

কাজী নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে খ্যাত হলেও তাঁকে 'প্রেমের কবি' কিংবা 'প্রেমিক কবি' বললে অত্যুক্তি হবে না। বিভিন্ন কবিতার পঙ্‌ক্তিতে ও গানের কথায় তাঁর প্রেমিক মনের পরিচয় মেলে। ব্যক্তি জীবনেও তিনি ছিলেন প্রেমিক। বিশেষ করে নার্গিসের সঙ্গে তাঁর প্রেমের কাহিনী সর্বজনবিদিত।

অল্পদিনের প্রেম হলেও তা এতো গভীর ছিল যে, এক নার্গিসকে নিয়ে তিনি লিখেছেন অজস্র অজর কবিতা, অসংখ্য অমর গান।

তবে 'নজরুল-নার্গিস' প্রেমকাহিনী মিলনাত্মক নয়। মধুর প্রণয় পরিণয়ে পরিণত হওয়ার পরপরই তা তিক্ততায় রূপ নেয়। আর এই অম্ল-মধুর প্রেম তাঁকে সাহিত্য-জীবনে করেছে প্রেমের দেবতা। সম্পর্ক অল্পদিনের হলেও এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। লেখনী থেমে যাবার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায়, গানে ফিরে এসেছেন নার্গিস। অপরদিকে নজরুলের প্রেমমুগ্ধ নার্গিসও কবিকে নিয়ে লিখেছেন।

নজরুলের জীবনে নার্গিস যতদিন ছিলেন, ততদিন যতটা না ছিলেন, তার চেয়ে বেশি ছিলেন যখন তিনি ছিলেন না। নজরুল পরবর্তী কবি হেলাল হাফিজ লিখেছেন, ...'মূলত ভালোবাসা মিলনে মলিন হয়, বিরহে উজ্জ্বল।' নজরুলের জীবনেও যেন ঠিক এটাই ঘটেছে। নজরুলের জীবনে থাকার সময় তার লেখনীতে তেমন ছিলেন না নার্গিস। কিন্তু যখন জীবনে ছিলেন না, তখন নজরুলের লেখায় হাজির হয়েছেন বারবার।

কবি, নাট্যকার ও গবেষক এম এ ওয়াহিদ তাঁর এই বইয়ে নির্মোহ ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন নজরুল ও নার্গিসের প্রেম ও বিরহের আখ্যান। নজরুল প্রেমীদের কাছে এ বইটি অনেক ভালো লাগবে বলে বিশ্বাস করি।

www.nagorikpathagar.org

দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামে ১৯৪৪ সালে লেখক এম এ ওয়াহিদের জন্ম। শৈশবে মাতৃ-পিতৃহীন এ লেখক মাতুলালয়ে লালিত পালিত হন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

ছোটবেলা থেকেই তাঁর লেখালেখির ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। লেখকের প্রকাশিত উপন্যাসের নাম 'জন্মই আজন্ম অপরাধ'। 'ইতিহাসের শাস্তি' নামে তাঁর একটি নাট্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া লেখকের বেশ কয়েকটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি রয়েছে। এগুলোর মধ্যে 'সরসীর আরসি', 'প্রেমের চিতা জ্বলে', 'নাট্য চতুষ্টয়', 'মোমের শরীর' এবং 'তবে তাই হোক' উল্লেখযোগ্য।

www.nagorikpathagar.org

নজরুলের জীবনে নার্গিস

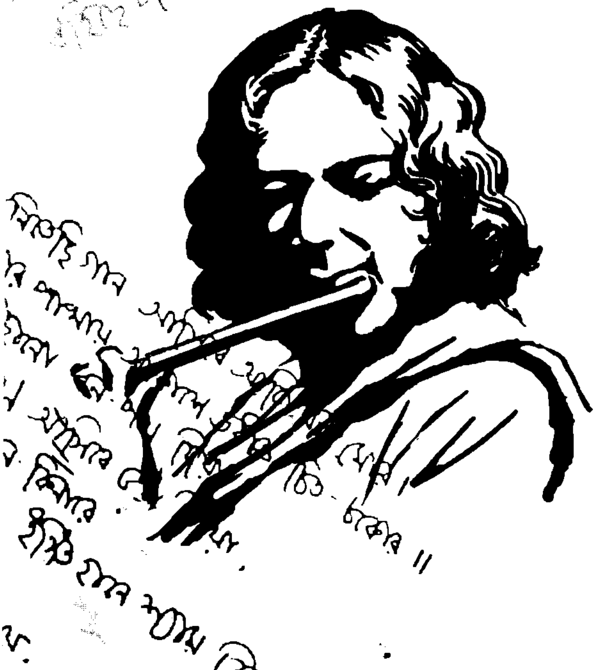

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

নজরুলের জীবনে নার্গিস

এম এ ওয়াহিদ

রিদম প্রকাশনা সংস্থা

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশক
মোঃ গফুর হোসেন
রিদম প্রকাশনা সংস্থা
১১/১ বাংলাবাজার, ইসলামী টাওয়ার
ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৬

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : হানিফ মাহমুদ

বর্ণবিন্যাস : ঈশিন কম্পিউটার

মুদ্রণ : ঢাকা প্রিন্টার্স
৩৬ শ্রীশদাস লেন ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২০০.০০ টাকা

Nazruler Jibone Nargis By M A Waheed Published by Md. Gofur Hossain. Rhythm Prokashona Sangstha, 11/1 Bangla Bazar, Islami Tower Dhaka-1100. Mobile : 01676533026, Date of Publication February 2016.
E-mail : Rythm.prokash@yahoo.com

Price : 200.00 US $ 10

ISBN 978-984-91995-9-5

U.K Distributor:Sangeeta Limited
22 Brick Lane, London
USA Distributor:Muktodhara
37-69, 75th st. 2nd Floor, Jackson Heights,
New York-11372
Canada Distributor:Anymela
2986 Darforth Ave, 1st Floor, Suite-202,
Toronto, No 416-690-3700
ATN Mega Store
2976 Darforth Ave, Toronto, No. 416-686-3134

রিদম প্রকাশনা সংস্থার যে কোনো বই ঘরে পেতে ভিজিট করুন :
www.rokomari.com/rhythm ফোনে অর্ডার করতে, ১৬২৯৭

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

একজন নজরুল ভক্তকে জানি,
যিনি ভিটেমাটি বন্ধক রেখে
কবি দর্শনে গিয়েছিলেন–
তাঁর স্মৃতি স্মরণে

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

পুবের ডাক

তরুণ এক রাজকুমার চলেছেন পুবের পথে। পুবের হাওয়া ডাক দিয়েছে। ঐ ডাক দিয়েছে পুবের হাওয়া, আর কি তাকে যায় গো পাওয়া? ডাক দিয়েছে সবুজ শ্যামল পল্লী মা। ইট-কাঠ পোড়া বিরস কলকাতা কি তাকে আটকাতে পারে? পুবের আবাহনে তাই তো তিনি ছুটে চলেছেন পুবের পথে। সূর্যোদয়ের পথে। ধানে ভরা গানে ভরা কুমিল্লার দৌলতপুরের পথে। বাঁধনহারা এ রাজকুমারকে রুখবে কে? তরুণ এ রাজকুমারের হৃদয় নেচে উঠেছে, তাকে বাঁধবে কে? মহাসমুদ্রের উত্তাল জোয়ার তোলপাড় তুলেছে। তাকে রুখবে কে? তিনি পথ চলেছেন গানে, গানে–

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে
বান ডেকে ঐ জাগলো জোয়ার
দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে।

আর দশটা ছায়া ঢাকা, পাখি ডাকা প্রশান্ত পল্লীর মতোই দৌলতপুর। অদেখা দৌলতপুরের বৃক্ষলতা, পত্র পল্লব, অবারিত ফসলের মাঠ, এ রাজকুমারকে হাতছানিতে ডাকছে– ওরে আয়, আয় পথভোলা? এখানে আয়? এখানে তোর প্রাপ্তি, এখাহে তোর পূর্ণতা। তারুণ্যে টগবগ সেই রাজকুমার অশান্ত চঞ্চলতায় ছুটে চলেছেন গোমতীর পুণ্যকুলে, দৌলতপুরে। দৌলতপুরের পুষ্পকোরকে আবিষ্ঠা প্রেমময়ীর আবাহনে যে প্রেমময়ী তাকে ডাক দিয়েছে চোখ ইশারায়–

আমায় ডেকেছে সে চোখ-ইশারায় পথে যেতে যেতে
ঐ ঘাসের ফুলে মটর-শুঁটি ক্ষেতে
আমার এ-মন- মৌমাছি ভাই- উঠেছে আজ মেতে।

(অ-কেজোর গান)

এ রাজকুমার আর কেউ নয়। চির চঞ্চল, বাণীর দুলাল, বাংলা সাহিত্য সাম্রাজ্যের বিদ্রোহী তুর্যবাদক, নবারুনের তারুণ্যে ভরা যুদ্ধ প্রত্যাগত সৈনিক কবি কাজী নজরুল ইসলাম। অবশ্য তখনো তিনি বিদ্রোহ ছড়াননি। হয়েও উঠেননি ধূমকেতুর বিস্ময় আর শিকল ভাঙার গানও তিনি তখনো গাইতে শুরু করেননি। এক অফুরন্ত সম্ভাবনাময় অরুণোদয়ের মাতাল রক্তিমাভা সবে ছড়াতে মহাব্যস্ত তখন তিনি।

www.nagorikpathagar.org

দৌলতপুর গমনের পটভূমি

কলকাতার ৩২ নাম্বার কলেজ স্ট্রিটে তখন থাকতেন কবি। একই বাসরে থাকতেন বন্ধু কমরেড মোজাফ্‌ফর ও আফজালুল হক। কমরেড তখন কলকাতার বাইরে। আলী আকবর খানের সহিত চট্টগ্রাম মেইলে কবি চলে গেলেন কুমিল্লায়। উদ্দেশ্য কুমিল্লা হয়ে যাবেন দৌলতপুরে, আলী আকবার খানের বাড়িতে।

পরদিন অনেকে এলেন কবির খোঁজে। কেউ এলেন লেখা সংগ্রহে। আবার কেউ এলেন সুরের সন্ধানে। কিন্তু কোথায় কবি। কবি তো নেই? কণ্ঠশিল্পী নলিনী কান্ত সরকারও কবির কাছে এসেছিলেন। তিনি হক সাহেবের কাছে কবির খোঁজ জানতে চাইলেন। হক সাহেব উত্তরে বললেন, সে তো কাল সন্ধ্যায় কুমিল্লায় চলে গেছেন। বিস্মিত শিল্পী ভ্রু কুঁচকে বললেন, কই কালকে তো তেমন কিছু বললেন না? বলবে কি করে- সহজ উত্তর হক সাহেবের। তারপর বললেন, কাল সন্ধ্যায় আলী আকবার খান এসেছিলেন। কবির কানে কানে কি যেন বললেন। আর অমনি বেরিয়ে পড়লেন কবি তার সঙ্গে।

নতুনের সন্ধানে পথচলার খেয়াল যার অদম্য, নতুনের আমন্ত্রণে উল্লসিত তিনি হবেনই তো? প্রায়শই হারিয়ে যেতেন কবি। হারিয়ে যাওয়া তার আজন্ম স্বভাব। অনেক খোঁজাখুজির পর তাকে উদ্ধার করা হতো কোনো আড্ডায়। চুটিয়ে আড্ডা মাত করছেন তিনি। সেই কাঠফাটা হাসি, আর ঝাঁকড়া চুলের বাবরি-নাচন। টগমগে তরতাজা তারুণ্যে প্রাণবন্ত চিরচঞ্চল কবি।

কবির কুমিল্লা গমন সুহৃদয়ের মধ্যে চলমান এক শীতল সংঘাতের পরিণতি ছাড়া আর কিছু নয়। আলী আকবার খান ও মোসলেম ভারত পত্রিকার পরিচালক আফজালুল হক কবি সুহৃদদের অন্যতম। তারা উভয়ে কবির প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ চাইতেন। এ সময় নবযুগ পত্রিকার কাজে কবিকে অমানবিক পরিশ্রম করতে হতো। কবি বন্ধু কমরেড মোজাফ্‌ফর এ পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক। তিনি কবিকে বেশি করে খাটিয়ে নিতেন। এতে করে কবির প্রতিভা বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি হতো। আর কমরেড় মোজাফ্‌ফর কমিউনিস্ট মতাদর্শে কবিকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চাইতেন।

আলী আকবার খান ও আফজালুল হক কমরেড মোজাফ্‌ফরের এ দুরভিসন্ধিমূলক আচরণকে কবির প্রতিভা বিকাশের অন্তরায় হিসেবে মনে করতেন। তারা উভয়ে মনে করতেন রাজনীতিবিদ অনেক জন্মায়। জাত কবি কয়জন জন্ম নেয়। কাজেই এ প্রতিভা বিনাশ করতে দেয়া যায় না।

একদিকে কমরেড মোজাফ্‌ফর ছিলেন কট্টর কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের। তিনি চাইতেন কবি মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়ে পোষাপাখির মতো কমিউনিজমের

www.nagorikpathagar.org

জয়গান করুক। নবযুগ পত্রিকাটি ছিল কমিউনিজমের মুখপাত্র। এ পত্রিকায় তিনি কবিকে বেশি বেশি করে খাটিয়ে নিতেন। কবির উপর অভিভাবকসুলভ আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করতেন।

অন্যদিকে আলী আকবার খান ও আফজালুল হক প্রমুখ ছিলেন ইসলামী চিন্তা-চেতনার ধারক। তারা চাইতেন কবি কমিউনিস্ট ব্যানার থেকে মুক্ত হয়ে মুক্তবুদ্ধির সৃজনশীল সাহিত্য চর্চা করুক। মূল বিরোধ এখানেই। আলী আকবার প্রমুখরা চাইতেন কবি নবযুগ পত্রিকার কর্মব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করুক। এজন্য তারা কবিকে অন্যত্র কোথাও সরিয়ে নেয়ার পরামর্শ করেন। এ পরামর্শ মতো কবি দেওঘরে চলে যান। কবির কলকাতা থেকে যাওয়ার জন্য কমরেড মোজাফ্‌ফর বিরূপ ধারণা পোষণ করেন। আলী আকবার খানকে এ ষড়যন্ত্রের মূলহোতা বলে মনে মনে বিদ্বেষ পোষণ করেন। এমনিতে আগে থেকেই তিনি আলী আকবার প্রমুখদের সাথে কবির মেলামেশা পছন্দ করতেন না। কবির না বলে চলে যাওয়া তিনি ভালোভাবে মেনে নিতে পারেন নাই।

দেওঘর থেকে কবি কলকাতায় ফিরে এলে আলী আকবার খান কবিকে তার গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। অন্যসূত্রে কবিই নাকি আলী আকবার খানের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। আলী আকবার খানের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাবে কমরেড মোজাফ্‌ফর বিরক্তি প্রকাশ করেন। নানা যুক্তিতে সেখানে না যাওয়ার জন্য কবিকে চাপ দিতে থাকেন। নানা কল্পিত বর্ণনা দিয়ে কবিকে নিবৃত্ত রাখার চেষ্টা করেন। তা সত্ত্বেও কবি আলী আকবারের সহিত তার গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার দৌলতপুরে চলে যান। কমরেড মোজাফ্‌ফর এটা ভালোভাবে মেনে নেননি। আর এ জন্য আলী আকবার খানকে এক হাত দেখে নেয়ার পরিকল্পনা করে সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন।

আলী আকবর খান ছিলেন ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি ছিলেন নাট্যকার ও ঐতিহাসিক। একজন সাহিত্যিক হিসেবেও তার প্রসিদ্ধি ছিল। তার বড় পরিচয় ছিল একজন সফল পুস্তক ব্যবসায়ী ও প্রকাশক হিসেবে। তিনি নজরুলের কবি প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ চাইতেন। সে মতে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

কবিকে একান্ত নিজের আয়ত্তে নেয়ার জন্য তার দ্বিমুখী উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত কবির লেখা প্রকাশ করে তার ব্যবসার বিস্তার। দ্বিতীয়ত বন্ধনহারা কবির প্রতিষ্ঠা প্রদান। একজন উঠতি কবির জন্য এটা কম পাওয়া নয়। স্বার্থে উভয়ই সমান সমান ছিল।

www.nagorikpathagar.org

জাত কবি নজরুল

কবি হিসেবে নজরুল ছিলেন জাত কবি। তার কবি প্রতিভা যেন সৃষ্টা প্রদত্ত। লেখার জন্য তার কোনো পরিবেশ প্রয়োজন হতো না। বর্ষার গান শীতে আর বসন্তের গান বর্ষায় গাইতে তার কোনো অসুবিধাই হতো না। কলকাতার কর্মব্যস্ত মোড়ে বসিয়ে দিলেও তিনি নির্দ্বিধায় লিখে যেতেন। একই আসরে ভজন, ভাটিয়ালী, ইসলামী, মারফতী ও আধুনিক সুরারোপ করতে বেগ পেতে হতো না তাকে। এ যেন আলমিরার সেলফে তুলে রাখা সামগ্রী। যেমন ইচ্ছা বের করে বিতরণ করতে আয়াস নেই। নিজের রচিত গানে কবি নিজে সুরারোপ করতেন। তাই বাণী আর সুরের অপূর্ব যোজনা সৃষ্টি হতো। বাণীর সহিত সুরের মুর্ততা মূর্তিমান হয়ে দোলা দিয়ে যেত।

কবির লেখা তখন (শুধু তখন কেন পরেও) স্বনামে-বেনামে চালিয়ে দিচ্ছিলেন অনেকেই। প্রকাশক, গ্রামোফোন কোম্পানিগুলো জলের দামে কিনে নিতেন। সামান্য অর্থের বিনিময়ে তিনি তার লেখার স্বত্ব বিক্রি করে দিতেন। লেখা নিয়ে তিনি বাণিজ্যিক চিন্তা করতেন না। তা করলে তিনি লাখপতি হতে পারতেন। দারিদ্র্য তার জীবনসঙ্গী হতো না। এ বিষয়ে তার অনেক হিতৈষী সজাগ করে ছিলেন। তবু কবির কোনো মাথা ব্যথাই ছিল না কখনো। নাম ও তারিখের বালাই ছিল না তার লেখায়। ছিল না রক্ষণাবেক্ষণের ঝাঁয়-ঝামেলা। এমনি ছিল তার লেখার হাল।

আগেই বলেছি, তার লেখা ও সুর অনেকে বেনামে চালিয়ে যেতেন। কবির সুহৃদয় হিতৈষীগণ এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে গর্বিত কবি স্বগর্বে উত্তর দিতেন, নদী তো সাগর থেকেই জল নেবে এতে আর বিচিত্র কি?

যাত্রা বিরতি কুমিল্লায়

যাত্রা বিরতি ঘটলো কুমিল্লায়। আলী আকবার খান কবিকে নিয়ে কুমিল্লায় পৌঁছলেন রাতে। সে সময় কুমিল্লা থেকে দৌলতপুর যাওয়ার সহজ সুবিধা ছিল না। অনন্যোপায় আলী আকবার খান কবিকে নিয়ে কুমিল্লার কান্দিরপাড়ায় উঠলেন শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসায়। বর্তমানে কান্দিরপাড়া নজরুল এভিনিউ নামে পরিচিত। ইন্দ্রকুমার তখন কুমিল্লা কোর্ট অব ওয়ার্ডের ইন্সপেক্টর। তার পুত্র শ্রীমান বীরেন্দ্র কুমার সেনগুপ্ত ছিলেন কুমিল্লা জেলা স্কুলে আলী আকবার খানের সতীর্থ। সে সুবাদে গুপ্ত পরিবারে আলী আকবার খানের ছিল অবাধ যাতায়াত। বীরেন্দ্র কুমার সেনগুপ্তের মা শ্রীমতি বিরজা সুন্দরী দেবীকে মা বলে ডাকতেন আলী আকবার খান।

পরকে আপন করার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল কবির। আলী আকবার খানের দেখাদেখি কবিও বিরজা সুন্দরী দেবীকে মা ডাকতে শুরু করেন পলকে।

www.nagorikpathagar.org

ঝাঁকড়া চুলো বড় বড় চোখওয়ালা তরুণ কবি কণ্ঠের মা ডাক বিরজা সুন্দরীর মাতৃময়ী পীযুষ-ধারা উথলে দিত। বড় ভালো লাগতো তার।

পরদিন আলী আকবার খানের গ্রামের বাড়ি দৌলতপুরে যাবার কথা। কিন্তু বিহু সংক্রান্তি এবং তার পরদিন বাংলা নববর্ষ। অতিথি বিদায় অকল্যাণের বিধায় তাদের যেতে দিলেন না বিরজা সুন্দরী দেবী। আগে থেকেই গুপ্ত পরিবারে গান বাজনার সুখ্যাতি ছিল। প্রায় সকলের গানের গলাও ছিল চমৎকার। পরদিন কবি গান গেয়ে, আবৃত্তি করে, হারমোনিয়াম বাজিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়েছিলেন।

নববর্ষে উৎসবমুখর কুমিল্লা। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবিও গান গেয়েছিলেন। হারমোনিয়ামে অশ্রুতপূর্ব সুরলহরী তুলে কুমিল্লাবাসীকে বিমুগ্ধ করেছিলেন। তখনকার কুমিল্লার হিন্দু বাবুরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, এ মুসলমান কবি প্রকৃতই একজন গুণীজন।

প্রথম প্রিয়ার অন্বেষায়

কুমিল্লা থেকে দৌলতপুর। নৌকায় ও পদব্রজে। দুপাশে অপূর্ব প্রকৃতির লীলাময়ী সৌন্দর্যে অভিভূত কবি মন। গ্রামের পর গ্রাম। মাঝে বিসর্পিল রাঙ্গামাটির পথ। পত্রপল্লবিত সবুজে ঘেরা গ্রাম। যেন কোনো শিল্পীর পটে আঁকা খেলাঘর। প্রসারিত প্রান্তরজুড়ে অবারিত ফসলের মাঠ। দিকবলয়ে সবুজে নীলে কোলাকুলি। ছোট-বড় নদী আর হাওর-বাঁওড়ে ভরা কুমিল্লা। বট-পাকুড়ের বিশাল মহীরুহ। তল দিয়ে ঝরা পাতা মচমচিয়ে চলেছেন চারণ কবি। পথপ্রদর্শক আলী আকবার খান আগে আগে চলেছেন। পেছনে মন্ত্র চালিতের ন্যায় চলেছেন কবি। অফুরান নৈসর্গিক বিমূর্ততায় বিমুগ্ধ কবি রবীন্দ্রের সুরে গুণগুণিয়ে পথ চলছেন–

> গ্রামছাড়া ওই রাঙ্গা মাটির পথ
> আমার মন ভুলায় রে।

উচ্ছ্বসিত কবি হৃদয়। গ্রামবাংলার অভূতপূর্ব সৌন্দর্য শোভা তিনি ইতিপূর্বে কখনো দেখেননি। এমন সৌন্দর্য অবলোকনে কবি বিমুগ্ধ। কবি হৃদয় এ অকৃত্রিম সুন্দরের প্রতি আপস্নুত হয়ে পড়ে। সীমাহীন এক সৌন্দর্যময় স্বপ্নরাজ্যের গভীরে কবি মানস তন্ময় হয়ে পড়ে। আহ্! এমন শোভিত সৌন্দর্যও হতে পারে। দৃষ্টি বিভোল কবির নয়ন স্বপ্নময় হয়ে উঠে।

কবির মনে হয় এ অসীম সৌন্দর্যময় স্বপ্নরাজ্যের গভীরে তার স্বপ্নময়ী রাজকন্যা তারই প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে। এ রাজ্যময় রাজকন্যাকে জয় করবার

www.nagorikpathagar.org

জন্যই তো তার এ অন্তহীন অভিযাত্রা। ওই তো সম্মুখে সৌন্দর্যখনির ঐ পারে তার প্রত্যাশিত স্বপ্নপুরী। ওইখানেই তার মনমানসী বিধুরা প্রেয়সী লাজরাঙ্গা কোনো এক পল্লীবালা নববধূ সেজে তারই প্রতীক্ষায় কাল গুনছে। কবির কল্পনায় নিয়তই সে প্রতিকৃতি বারবার প্রতিভাত হয়। হয়ত গ্রাম্য এ মেঠোপথের প্রান্তে সে মানসীর দর্শন তিনি লাভ করবেন। হয়ত তার মেঘলামতির দেশের মেঘ বরণ কন্যা সেখানে অবগুণ্ঠিতা। তাকে খুঁজতেই তো কবির উদ্দেশ্যহীন এ যাত্রা। কবির মহাপ্রাপ্তির মহামঞ্জিল ওই দেখা যায়। আনন্দে শিষ দিয়ে উঠেন কবি–

হয়ত তোমার পাব দেখা
সেখানে ওই নত আকাশ
চুমছে বনের সবুজ রেখা
ওই সুদূরের গাঁয়ের পাশে
আলের পথে বিজন ঘাটে
ধরবে আমার হাতটি একা।

হ্যাঁ, প্রতি তারুণ্যে স্বপ্ন জাগায় তার প্রথম প্রিয়া। ছন্দে নাচায়, গন্ধে ভাসায়, দ্বন্দ্বে কাঁদায় তার প্রথম প্রিয়া। কবিরা তো এর থেকে ব্যতিক্রম নন। কি রাজকুমার কি কপর্দকহীন কাঙ্গাল, কি কবি কি অকবি, কি পরাক্রম সমরবিদ, কি দুরন্ত ক্রীড়াবিদ সব তারুণ্যে তার প্রথম প্রিয়া তাকে উন্মাদ, উন্মন করে তোলে। বিশ্বকবির তারুণ্যেও তার প্রথম প্রিয়ার ছোঁয়া লেগেছিল। তিনিও বেরিয়ে পড়েছিলেন তার প্রথম প্রিয়ার সন্ধানে–

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কবি সংবর্ধনা দৌলতপুরে

কবি সংবর্ধনার দিক-নির্দেশনা দিয়ে পূর্বাহ্নে দৌলতপুরে খবর পাঠিয়েছিলেন আলী আকবার খান। সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছিল দৌলতপুরে। কবি বরণের বিরাট তোরণ নির্মিত হয়েছিল। কবিকে স্বাগত জানাবার বহুমুখী প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল সেদিন। বরণ সঙ্গীতের সঙ্গে মাল্যভূষিত করা হয়েছিল কবিকে।

www.nagorikpathagar.org

তাজা ফুলে সুবাসিত তোড়া দেয়া হয়েছিল কবির হাতে। কুসুম বিছানো পথে কবি প্রবেশ করেছিলেন কুমিল্লার দৌলতপুরে। আপামর জনতার ঢল নেমেছিল সেদিন দৌলতপুরে। উঠতি এক কবির জন্য একি কম পাওয়া? আর এটিই ছিল কবির প্রথম সম্মাননা ও সংবর্ধনা।

দৌলতপুরের খাঁ পরিবার

কুমিল্লার উত্তরে মুরাদনগর থানা। এ থানার একটি গ্রাম দৌলতপুর। দেশের আর দশটি ছায়া ঢাকা পাখি ডাকা গ্রামের মতোই দৌলতপুর। দৌলতপুরের খাঁ বাড়ি গ্রামের মধ্যে প্রধান বাড়ি। খাঁ পরিবার গ্রামের মধ্যে ধনাঢ্য পরিবার। শিক্ষা, দীক্ষা ও ব্যবসায় তারা ছিল অগ্রণী। তারা ছিল বনেদী।

বাগবাগিচা পরিবেষ্টিত বিরাট দক্ষিণ দুয়ারী বাড়ি ছিল খাঁদের। বড় বড় ঘর ছিল তাদের। বাড়ির পূর্ব ধারে ছিল শান বাঁধানো বিশাল দীঘি। বাড়ির সম্মুখে দৃষ্টি অবারিত ফসলের মাঠ। বাড়ির সঙ্গেই ছিল সরকার পরিচালিত নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।

দীঘির পশ্চিমে ছিল খাঁ বাড়ির বৈঠকখানা। বাঁশ ও বেতের নিপুণ কাজ করা বেড়ার চৌচালা। অতিথি অভ্যাগতের থাকবার জন্য এটি ব্যবহার হতো। এ ঘরের পাশেই ছিল একটি কামরাঙ্গা গাছ ও একটি আমগাছ। দক্ষিণে ছিল বাড়ির বহিরাঙ্গন। বহিরাঙ্গনের পশ্চিমে ছিল একটি গাব গাছ। কবির লেখায় এগুলোর উল্লেখ মিলে।

এ খাঁ বাড়িরই একজন পূর্ব কথিত আলী আকবার খান। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অকৃতদার। যতদূর জানা যায়, তারা ছিলেন পাঁচ ভাই ও তিন বোন। আলী আকবার খান ছিলেন কনিষ্ঠ। বড় বোন আছমাতুন। বিয়ে হয়েছিল দৌলতপুরের পার্শ্ববর্তী দেওয়ান বাড়িতে। মধ্যমা বোন এখতারুন নেসা ছিলেন বিধবা ও নিঃসন্তান। তিনিই খাঁ বাড়ির কর্ত্রী ছিলেন। অন্দরের সবকিছু তার কথামতোই নির্বাহ হতো। দৌলতপুরের অদূরে ছিল ধর্মসাগর। একটি বিশাল প্রাচীন দীঘি। এ দীঘিটিও ছিল শান বাঁধানো। কতকাল পূর্বে খনিত হয়েছিল কে জানে? তবে নির্জন তন্ময়তার জন্য এটি অতি মনোরম ছিল।

হৃদয়হরা দিনগুলো

আলী আকবার খানের ভাগিনা মুন্সী আব্দুল জব্বার তার স্মৃতি কথায় লিখেছেন, কবিকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আগ বাড়িয়ে লোক পাঠানো হয়েছিল। গ্রামের হিন্দু মুসলমান, যুবা-কিশোর খাঁ বাড়িতে যেন ঢল নেমেছিল সেদিন। অপরাহ্ণ বেলায় কবি পৌছেছিলেন দৌলতপুরে। কবি- সম্মোধনান্তে প্রাথমিক আদর

www.nagorikpathagar.org

আপ্যায়ন ও পরিচিতি চলতে থাকে। কবির গান শোনার জন্য চারদিক থেকে লোকজন জমায়েত হতে থাকে। দুপুরের পরেই খাঁ বাড়ির দক্ষিণের গাবগাছের অনেকখানি স্থানজুড়ে গণজমায়েত বসেছিল সেখানে। বিকালে কবি এ আসরে গান গেয়ে, বাঁশি বাজিয়ে দ্রুততালে হারমোনিয়াম বাজিয়ে সকলকে বিমোহিত করেন।

প্রাণখোলা মানুষ ছিলেন কবি। পরকে আপন করার অসীম ক্ষমতা ছিল তার। হৈ-হুল্লোড় আর ব্যস্ততা লেগেই থাকতো সব সময়। অতি অল্প সময়ে বাড়ির ছোট বড় সকলকে তিনি একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে একটা পরম আত্মীয়ের ভাব সৃষ্টি হয়েছিল। খাঁ বাড়ির একজনের মতোই আচার-আচরণে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিলেন অতি অল্প সময়ে।

আলী আকবার খানের বড় ভাই নেজামত আলী খান কবির স্মৃতিচারণ করে বলেন, ঝাঁকড়া চুল নাচিয়ে কবি প্রাণ খুলে গাইতেন। সারাদিন হাসি খুশিতে মেতে থাকতেন। আর মাতিয়ে রাখতেন সবাইকে। শুধু খাঁ বাড়িতে সীমাবদ্ধ থাকতেন না তিনি। খাঁ বাড়ির কটি মেয়েকে নাচও শিখিয়েছিলেন। তাদের পায়ে ঝুঁমুর বেঁধে।

কখনো কখনো জোসনা রাতে আপন মনে পুকুর পাড়ের আম গাছের গুঁড়িতে বসে কবি বাঁশি বাজাতেন। গ্রামের ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ অদূরে ঠাঁই দাঁড়িয়ে সে সুর সুধা উপভোগ করতেন।

কবির সবচেয়ে প্রিয় ছিল পুকুরে স্নান করা। একবার সাবান মাখতে শুরু করলে তা চলতো দীর্ঘক্ষণ। পুকুরে সাঁতার কাটা ছাড়াও এপারে ডুব দিয়ে ওপারে ভেসে ওঠা ছিল কবির পরম আনন্দের বিষয়। দীর্ঘ সময় কাটাতেন পুকুরে। প্রতিদিন এমনি অভ্যাস ছিল কবির। ওদিকে ভাত বেড়ে বসে থাকতেন মাতৃময়ী এখতারুন নেছা। ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যেত। বিরক্ত হতেন না। তাগাদাও দিতেন না। একান্ত মায়ের মতো ভাত আগলে বসে থাকতেন।

খাঁদের এক পড়শী বেঙ্গু মৌলভী। পুকুরের উত্তরপাড়েই যার বাড়ি। তিনি কবির স্মৃতি রোমন্থন করেছেন এভাবে, সাঁতার কাটতে কাটতে গান গাওয়া ছিল কবির প্রচণ্ড শখ। বড় দুরন্ত ছিলেন কবি। যখন হারমোনিয়াম বাজাতেন মনে হতো তিনি যেন সুরের জাদুকর। এমন বাজনা আমি আর কোথাও শুনি নাই। সেই বাঁশির সুর আমার কানে আজও বাজে। আজও মনে হয় পুকুর থেকে ভেসে আসে সেই সুর আর সেই বাঁশির ধ্বনন। কৃষ্ণের বাঁশি বাজতো কদমতলায়। আর কবির বাঁশি বাজতো আমতলায়।

লেখার মুড এলে কবি নাওয়া খাওয়া ভুলে যেতেন। লেখায় ডুবে থাকতেন। লেখার মাঝে একঘেয়েমি কাটাবার জন্য দক্ষিণের আল পথে

www.nagorikpathagar.org

ঘোড়ার দুলকি চালের মতো দৌড় মেরে ফিরে এসে আবার লেখার মাঝে ডুবে যেতেন।

গ্রামের কারো বাড়িতে যেতেন না কবি। খাঁ বাড়িতেই থাকতেন সর্বক্ষণ। গ্রামের কয়েকজনের সাথে কবির গভীর সখ্যতা ছিল। এরা ছিলেন ওই অঞ্চলের নামকরা গাইয়ে। এদের মধ্যে সাদত আলী মাস্টার ছিলেন অন্যতম। কবি এদের গান শুনতেন এবং উৎসাহ দিতেন।

দৌলতপুরের অকৃপণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও একান্ত পল্লীর নিরিবিলি সুশান্ত গাম্ভীর্যের মধ্যে কবির লেখার প্রেরণা জোগাত। অজস্র কবিতা ও গান লিখেছিলেন কবি এ সময়। কোনো দিকে মনোবিবেশ করার ফুরসত ছিল না কবির। এ সময় শিশুতোষ কবিতা ও মানস প্রতিমার প্রতি প্রেম ব্যঞ্জনাময় কবিতা ও গান লিখেন। সন, তারিখ ও স্থানের উল্লেখ থাকতো না তার এ সময়ের লেখায়। অল্প কটিতে কুমিল্লা ও দৌলতপুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সময়ের লেখার সম্ভারে ভরে উঠেছে তার পুবের হাওয়া, দোলনচাঁপা, ছায়ানট, চক্রবাক ইত্যাদি।

মাঝে মাঝে বিকালে কবি হারিয়ে যেতেন। দৌলতপুরের অদূরে ধর্মসাগর কবিকে টেনে নিয়ে যেত। দীঘির শান বাঁধানো ঘাটে বসে গভীর তন্ময়তায় ডুবে যেতেন কবি। কখন সন্ধ্যা নেমে আসত সেদিকে খেয়ালই থাকত না তার। কী ভাবতেন কবি? তা কল্পনায় ফুটে তুলেছেন এ যুগের ড. আশরাফ সিদ্দিকী–

এই দীঘির ধারে স্নান জোসনায়
আমি যেন তাদের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি
শতবর্ষের ওপার থেকে
যে কণ্ঠস্বর শুনতো তরুণ কবি নজরুল
বারবার এসে বসতেন এই দীঘির ধারে
ঢেউয়ের সঙ্গীতে কবি কি শুনতেন?
তার প্রিয়ার কাকনের রিনিঝিনি
তার মলিন হাসি
যিনি ছিলেন এই কুমিল্লার এক সুন্দরী কিশোরী

(ধর্ম সাগর-৯৯)

কবি প্রাণভরে গ্রহণ করেছিলেন দৌলতপুরকে। দৌলতপুরও যেন কবিকে আপনার গভীরে টেনে নিয়েছিল। কবির এ স্বেচ্ছা নির্বাসন (প্রায় আড়াই মাস) এ সময়ে ঘটেছিল কত হাসি কান্না, মান অভিমান। ঘটেছিল কত প্রেম ও

www.nagorikpathagar.org

প্রণয়। রচিত হয়েছিল কত কবিতা ও গান, যা দৌলতপুরকে আলাদা ঐতিহাসিক গাম্ভীর্যে উজ্জ্বল করে রেখেছে।

দৌলতপুরে কবি জীবনের মধ্যে আর একটি পূর্ণ জীবনের সন্ধান পাই। যে জীবনে আছে প্রেম বিরহ, আছে অর্জন ও বিসর্জন। আর কালোত্তীর্ণ হাহাকার, যা পৃথিবীর যে কোনো প্রেম আখ্যানকে হার মানায়।

উদ্দেশ্যে মাত্রাযোগ

কবি বন্ধু আলী আকবার খান, যার আমন্ত্রণে কবি দৌলতপুরে এসেছেন এবং স্বেচ্ছা প্রবাস যাপন করছেন। তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল কবিকে প্রতিষ্ঠা দেয়া এবং লেখা প্রকাশ করে নিজেও লাভবান হওয়া। এবার নিজ আলয়ে একান্ত নিজ আয়ত্তে পেয়ে তার উদ্দেশ্যে আর একটা মাত্রা যোগ হলো। আর তা হলো প্রতিভাবান এ কবিকে খাঁ বাড়ির জামাতা করে নেয়া যায় কিনা। কিন্তু এ বিষয়ে বোন এখতারুন নেছার উৎসাহ পাওয়া গেলেও ভাইয়েরা বাদসেধে বসেন। তাদের ধারণা চালচুলোহীন এ বাউন্ডেলে কবির ধনাঢ্য খাঁ বাড়ির জামাতা হবার যোগ্যতা কোথায়? এ ব্যাপারে ভাইদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হলো। অবশেষে বোন এখতারুন নেছার সমন্বয়ে ভাইদের মধ্যে একটা সমতা সম্পন্ন হলো।

কনে দেখানো হলো কবিকে। আলতাফ আলী খাঁর মেয়ে টুনি, ওয়ারেছ আলী খাঁর মেয়ে নুরজাহান (কবি যাকে হেনা বলে ডাকতেন) ও মেজাবত আলী খাঁর কন্যা আম্বিয়া খানম ওরফে মানিককে দেখানো হলো। একজনও কবির পছন্দ নয়। যদিও কবি এদের নাঁচ শিখিয়েছিলেন। নিরুৎসাহিত হয়ে আলী আকবর খান ও এখতারুন নেছা এক প্রকার হাল ছেড়েই দিলেন।

প্রথম প্রিয়ার প্রথম দর্শন

প্রথম প্রিয়ার জন্য কবি প্রতীক্ষায় কাতর। যার অন্বেষায় তিনি আজ যাযাবর, স্বেচ্ছা নির্বাসনে। সেই মানস বধূর আজও দর্শন লাভ ঘটে নাই। হৃদয় দুয়ারে কবি যার পদধ্বনি শুনতে পান। কবির অন্তরাত্মা যার আগমনী শুনতে পায়। গানে ও সুরে যাকে আবাহন করে চলেছেন কবি। যার প্রতিমা নিয়ত রচনা করেন হৃদয় গভীরে, আজও দর্শন সম্ভব হয়ে উঠে নাই তার। কিন্তু অন্বেষণের অবধি নাই, প্রতীক্ষার বিরাম নাই, অবসাদ নাই কবির স্বপ্ন দেখার। যেদিন সেই দিব্য মানসীর চরণ পড়বে কবির হৃদয় পটে, যেদিন তার দর্শন ঘটবে, কেবল সেই দিনই ঘটবে কবির উদগ্র কামনার সুশান্ত সমাধি। কবি সেই দুর্লভ মুহূর্তের প্রতীক্ষায় কাতর।

www.nagorikpathagar.org

অকস্মাৎ সেই চরম মুহূর্ত সমাগত। উৎসবমুখর খাঁ বাড়ি। খাঁ বাড়িতে আজ বিবাহ উৎসব। বর মুন্সী আব্দুল জব্বার দেওয়ান আর কনে? তারই আপন মামাতো বোন পূর্বোক্ত মানিক। এন্তার আমোদ ফুর্তি হয়েছিল এ বিয়েতে। কবি বর কনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন তার 'লাল সালাম' কবিতাটি এ বিবাহ মজলিসে।

মুন্সী আব্দুল জব্বারের বিয়েতে কবি ও সৈয়দার প্রথম দর্শন ঘটে। বিয়ের মজলিসে কবি ও সৈয়দা এক সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করেন। বিয়ে মজলিসেই কবি সৈয়দার নতুন নাম দেন নার্গিস আসার খানম। এ নামেই তিনি পরবর্তীতে পরিচিতি লাভ করেন। উল্লেখ্য যে, সৈয়দা বর আব্দুল জব্বারের একমাত্র বোন।

কবি ও নার্গিসের রাগ-অনুরাগের সূত্রপাত এখানে। প্রথম দেখাও এখানে। তাদের প্রথম প্রেমের সূচনাও এখানে। কনে হিসেবে নার্গিস কবির দারুণ পছন্দ। কবি তাৎক্ষণিকভাবে প্রথম প্রিয়ার উদ্দেশ্যে গান রচনা করে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুরারোপ করে বিয়ের মজলিসে গেয়ে শোনালেন। গানের প্রথম কলি–

প্রিয়ার কাঁকন চুড়ির কঙ্কন

প্রেমভিখারী কবি হয়ে উঠেন প্রেম উন্মুখ। অপরদিকে নার্গিসও হয়ে উঠেন প্রেমপ্রবণ। সুদর্শন ঝাঁকড়া চুলো ডাগর চোখের ভরাটদেহী কবির মধ্যে নার্গিস নিঃশব্দে নিঃশেষে আপনাকে হারিয়ে ফেললেন। যৌবনের রঙিন নেশার সোনালী স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়লেন দুজনে। কদমতলার কৃষ্ণের বাঁশিতে শ্রী রাধিকা যেমন আপনাকে কৃষ্ণ প্রেমে উৎসর্গ করেছিলেন, তেমনি আমতলার কবির বাঁশিতে আপনাতে নিঃশর্তে নিবেদন করেছিলেন। কবির লেখায় সুন্দরভাবে সে সত্য ফুটে উঠেছে–

মনে পড়ে, বসন্তের শেষ আশা স্নান মোর
আগমনী সেই নিশি
যেদিন তোমার আঁখি ধন্য হলো
তব আঁখি চাওয়া মনে মিশি।

এই যে দুটি অচেনা, অজানা হৃদয়ে সৃষ্টি হলো এক সুগভীর প্রেমবন্ধন। পরস্পরের এত প্রীতি, এত সুধা, চাওয়া ও পাওয়ার অনির্বার এক আকর্ষণ কোথা থেকে এলো? এর উত্তর কবিই দিয়েছেন–

www.nagorikpathagar.org

তবু তব চোখে–মুখে এ অতৃপ্তি এ কী স্নেহ-ক্ষুধা!
মোরে হেরে উছলায় কেন তব বুক ছাপা এত প্রীতি-সুধা ?
সে রহস্য, রানী!
কেহ নাহি জানে–
তুমি নাহি জান–
আমি নাহি জানি।
চেনে তাহা প্রেম, জানে শুধু প্রাণ–
কোথা হ'তে আসে এত অকারণে প্রাণে প্রাণে বেদনার টান!...
(পূজারিণী)

বোন এখতারুন নেছার উৎসাহে এবার বিয়ের প্রস্তাব সম্মতি লাভ করলো। আলী আকবার খানের সম্মতি তো ছিলই, এবার তার ভাবনায় তিনি দুটি দিক তুলে ধরলেন। এক– এ বিয়েতে পথের কবি পাবে ঘর। দুই– নার্গিসের ভারতী লাইব্রেরি ঢাকা-কলকাতা তথা সারা বাংলাদেশে প্রসার লাভ করবে আর কবির লেখাও এখান থেকে প্রকাশিত হতে পারবে।

মাতৃময়ী এখতারুন নেছা এ সময় কবি ও নার্গিসের রাগ-অনুরাগ, মান অভিমান ও আবদার অভিযোগের সমন্বয় করতেন। তাদের হৃদয় ঘটিত চাওয়া পাওয়ার সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ করে দিতেন। ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন ও ঘর বাঁধার পরিকল্পনার নকশা তৈরি করে দিতেন। এক কথায় এ দুটি হৃদয়ের সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করতেন। অন্যদিকে অন্য ভাই ও বোনদের সম্মতি ও সমর্থন লাভে ব্রতী ছিলেন।

কবির অদম্য উৎসাহ ও সম্মতি সাপেক্ষে বিয়ের দিন তারিখ পাকাপাকি হলো জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষী। মধু বাসরের অপেক্ষায় কবি উদগ্রীব। মনে মনে বাসর স্বপ্ন আঁকতে থাকেন। এ সময়ে কবি মানসের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার জ্যৈষ্ঠের লেখা 'বিধূবা পথিক প্রিয়া' তে–

ওঠ পথিক পূজারিণী উদাসিনী বালা
সে যে সবুজ দেশের অবুঝ পাখি
কখন এসে যাবে বাঁধন
কে জানে ভাই ঘরকে চলো
ওকি চোখে আবার নামলো বাদল ছায়া ঢলঢল
চল সখী ঘরকে চল
(ছায়ানট)

www.nagorikpathagar.org

দেওয়ান বাড়ির নার্গিস

আলী আকবার খানের বড় বোন আসমাতুন নেছার বিয়ে হয়েছিল খাঁ বাড়ির অদূরে দেওয়ান বাড়িতে। দেওয়ানদের পূর্ব পুরুষরা এসেছিলেন ইরান থেকে। তাদেরই কেউ পরবর্তীতে মুর্শিদাবাদের নবাবদের দেওয়ান ছিলেন। সেই সুবাদে ও বাড়ির নাম দেওয়ান বাড়ি। মুন্সী ছিল ওদের নবাব প্রদত্ত পদবী।

পূর্বকথিত মুন্সী আব্দুল জব্বার দেওয়ান ও সৈয়দাকে (ওরফে কবি প্রদত্ত নার্গিস আসার খানম) রেখে আসমাতুন নেছার স্বামীর মৃত্যু হয়। পুত্র কন্যার সুখ চেয়ে আসমাতুন নেছা ওই বাড়িতে বৈধব্য জীবনযাপন করতে থাকেন।

কবি যখন দৌলতপুরে তখন মুন্সী আব্দুল জব্বার বিএ পাস করেছিলেন। আর সৈয়দা তখন আইএ পাস। আজন্ম সৈয়দা ছিলেন সাহিত্যানুরাগী ও সঙ্গীত পিপাসু। সঙ্গীতের প্রবল আসক্তির কারণে পারিবারিক সম্মতিতে তিনি স্বগ্রামের মরমী কবি ও গাঁইয়ে সাদত আলী মাস্টারের নিকট সঙ্গীতের তালিম নেন।

সাহিত্য ক্ষেত্রেও সৈয়দার হাত ছিল। কবির প্রেম পরশে বিদগ্ধ সৈয়দা, তাহমিনা, ধূমকেতু রচয়িতা ছিলেন। এছাড়াও প্রায় ডজনখানেক পাঠ্যপুস্তক লেখেন। ফলশ্রুতিতে ১৯৮০ সালে সূমনা সাহিত্য গোষ্ঠী তাকে 'বিদ্যা বিনোদিনী' খেতাব প্রদান করেন।

ঢাকার বাংলাবাজারের ভারতী লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী ছিলেন নার্গিস। তাছাড়া কলতাবাজারে 'নার্গিস ম্যানসন' নামে তার একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল। এ বিচারে নার্গিস ফেলনা ছিলেন না বরং প্রকৃত অর্থেই তিনি দেওয়ান বাড়ির নার্গিসই ছিলেন। নার্গিস পিতৃহীনা হলেও রত্নতুল্য রূপের রানী ও গুণের গুণীনি ছিলেন। সেদিক দিয়ে কবির ভাগ্য ঈর্ষণীয় ছিল তাতে সন্দেহ নাই।

বিয়ে বিষয়ে কবির পত্রের উত্তরে ক'জন বন্ধু

কবির দৌলতপুরে স্বেচ্ছা নির্বাসনকে কেন্দ্র করে কবির বন্ধুদের কৌতূহল আর বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। তার উপর কবির স্বহস্তে লিখিত বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র পেয়ে তাদের বিস্ময়ের সীমা রইলো না। ঘনিষ্ঠ ক'জন বন্ধুকে লেখা কবির পত্রের উত্তর নিম্নে তুলে ধরা হলো-

* পবিত্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভাই নুরু, এই মাত্র তোর চিঠিখানা পেয়ে আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছি। কারণ দীর্ঘদিনগুলোতে কি ব্যাকুল প্রতীক্ষা নিয়েই না তোর চিঠির প্রতীক্ষা করে

www.nagorikpathagar.org

আসছিলাম। যখন আজ ভোরে জানলাম যে তুই স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে তাকে বরণ করে নিয়েছিস তখন আমার অবশ্য কোনো দুঃখ নাই। তবে একটি কথা তোর বয়স আমাদের চাইতে ঢের কম, অভিজ্ঞতাও তদনুরূপ। আর ফিলিংসের দিকটা অসম্ভব রকম বেশি। কাজেই ভয় হয় হয়তবা দুটি জীবনই ব্যর্থ না হয়। এ বিষয়ে তুই কনসাস তাহলে অবশ্য কোনো কথা নাই। যৌবনের চাঞ্চল্যে আপাতত মধুর মনে হলেও পরে পস্তাতে হয়। তুই নিজে যখন সবদিক ভেবেচিন্তে বরণ করাই ঠিক করেছিস তাহলে একান্ত কারণে তোদের মিলন কামনা করি।

*** সাতক্ষীরার সুসাহিত্যিক ও সহকারী সম্পাদক ওয়াজেদ আলী**
ভাই নজরুল, আপনার ৭ জুন তারিখের স্নেহমাখা চিঠিখানা আজ বিকালে পেয়ে অনেকবার পড়েছি। আর অশান্তির মধ্যেও খুব হেসেছি। নিভৃত পল্লীর যে কুঠির বাসিনীর (দৌলতপুরের দৌলতখানার শাহজাদী বলাই বোধ হয় ঠিক হবে) সাথে আপনার মনের ও জীবনের যোগ হয়ে গেছে তাকে শ্রদ্ধা ও আদাব জানবেন।

* কমরেড মো. মোজাফ্ফর (পূর্বোক্ত ওয়াজেদ আলীর নিকট হতে কবির বিয়ের খবর পেয়ে)

ভাই কাজী সাহেব,
ইতিপূর্বে আপনার কোনো পত্র পাইনি। ওয়াজেদ আলী সাহেবের চিঠিতে জানলুম যে, ৩ আষাঢ় তারিখে আপনার বিয়ে হচ্ছে। সময় খুব সংকীর্ণ। কাজেই আমার যাওয়া হচ্ছে না। তবে ভালয় ভালয় সব মিটে যাক, এ প্রার্থনা জানাচ্ছি খোদার দরবারে।

*** বিরজা সুন্দরী দেবী (আকবার আলী খান সে পত্র পৌঁছে দেন)**
মা তুমি না এলে আমার পক্ষে যে কেউ থাকছে না। তাই তোমাকে আসতেই হবে।

তোমার সাম্রাজ্যের যুবরাজ

আলী আকবার খানের নিমন্ত্রণপত্র
কবি ও নার্গিসের বিবাহ উপলক্ষে আলী আকবার খান একটি নিমন্ত্রণপত্র লিখেন। নিমন্ত্রণপত্রটি তার আত্মীয় বান্ধবসহ কবির বন্ধু ও সুহৃদদের বরাবর পাঠানো হয়েছিল। নিমন্ত্রণপত্রটি এরূপ-

www.nagorikpathagar.org

বিনয় সম্ভাষণ পূর্বক নিবেদন,
জগতের পুরোহিত তুমি, তোমার এ জগৎ সংসারে
এক চায় একেরে পাইতে দুয়ে চায় এক হইবারে
(রবীন্দ্রনাথ)

এ বিশ্ব নিখিলের সকল শুভ কাজে যার প্রসন্ন কল্যাণ অনিমেখ হয়ে রয়েছে, সেই পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার কল্যাণের ধারা শ্রাবণের ধারার মতোই ব্যাকুল বেগে আজ আমার ঘরে, আমাদের মুখের পরে বুকের পরে ঝরে পড়ছে। তার কল্যাণ আঁতুর আনত আঁখি সুনিবিড় চাওয়া কেমন এক করুণ আশিস ছেঁয়ে ফেলেছে।

শিশিরের মতো, ফুলের মতোই আজ তাই আমার প্রাণ, দেহ মন তার চরু ধুলোর তলে লুটিয়ে পড়ছে। তার ওই মহাকাশের মতো সিংহাসনের নিচে আমায় নত করে আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে, আমার পরম আদরের কল্যাণীয়া ভাগ্নি নার্গিস খানমের বিয়ে বর্ধমান জেলার ইতিহাস প্রখ্যাত চুরুলিয়া গ্রামের দেশ বিখ্যাত পরম পুরুষ আভিজাত্যে গৌরবে বিপুল গৌরবান্বিত আয় মাদার মরহুম মৌলভী ফকির আহমদ সাহেবের দেশ বিখ্যাত পুত্র মুসলিমকুলের গৌরব, মুসলিম বঙ্গের রবি কবি দৈনিক নবযুগের ভূতপূর্ব সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলামের সাথে। বাণীর দুলাল দামাল ছেলে বাংলার এ তরুণ কবি ও প্রতিভাবান লেখকের নতুন করে নাম বা পরিচয় দেবার নাই। এই আনন্দঘন চিরশিশুকে দেশের সকল লেখক লেখিকা, সকল কবি বুকভরা ভালোবাসা দিয়েছেন। সেই বাঁধনহারা যে দেশমাতার একেবারে বুকের কাছটিতে প্রাণের মাঝে আসনখানিতে পেতে রয়েছে। এর চেয়ে বড় পরিচয় আর নাই।

আপনারা আমার বন্ধু আপনজন। আমার গৌরবের, আমার এ আনন্দের দিনে আপনারা এসে আনন্দ করে আমার কুঠিরখানিকে পূর্ণ আনন্দ দিয়ে ভরে তুলুন। তাই এ নিমন্ত্রণ।

এমন আচমকা না চাওয়া, পথে কুড়িয়ে পাওয়া যে সুখে আমার হৃদয় কানায় কানায় পুরে উঠেছে। আপনাকেও যে এসে তার ভাগ নিতে হবে। এদের পাশে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত দিয়ে প্রাণভরে আশীর্বাদ করতে হবে। আর একা এলে তো চলবে না, সেই সঙ্গে আপনি ও আপনার সমস্ত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে আমার হয়ে পাকড়াও করে আনবেন এ মঙ্গল মধুর দৃশ্য দেখাতে।

বিয়ের দিন আগামী ৩রা আষাঢ়, শুক্রবার নিশীথ রাতে। নিশীথ রাতের বাদল ধারার মতোই আপনাদের সকলের মঙ্গল আশিস যেন এদের শিরে পড়ে

www.nagorikpathagar.org

একদিন। আমি তাই আজ জোর করেই বলছি, আমার এক বড় চাওয়ার অধিকার সম্মান হতে আপনাদের উপস্থিতি হতে আমায় বঞ্চিত করে আমার চোখের পানি দেখবেন না। আরজ।

দৌলতপুর, ত্রিপুরা
২৮ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮

বিনীত
আলী আকবার খান

বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র সকলের নিকট পৌঁছেছিল। সে সময় রেল শ্রমিকদের ধর্মঘটের দরুণ কেউ এ বিয়েতে আসতে পারেন নাই। কমরেড মো. মোজাফ্ফরও নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। তবে পেয়েছিলেন বিয়ের পরে। নিমন্ত্রণপত্রের উত্তরে ২১ শে জুন, ১৯২১ তারিখে তিনি আলী আকবার খানকে একটা সৌজন্যপত্র প্রেরণ করেন। নিম্নে সে পত্রটি তুলে ধরা হলো–

খান সাহেব,
বিবাহের নিমন্ত্রণ পাইয়াছি। অবশ্য বিবাহ হইয়া যাইবার পর। যাহা হোক, আশা করি ভালোয় ভালোয় কার্য শেষ হইয়া গিয়াছে। মঙ্গলময়ের মঙ্গল আশিসে সংসার পথের এ নবীন পথিকদ্বয়ের জীবন ধন্য হোক, খোদার কাছে এ প্রার্থনা করিতেছি (ভালোয় ভালোয় কার্য শেষ হোক, এ আন্তরিকতা কমরেড়ের ছিল কিনা– এ প্রশ্নে পরে আলোকপাত করার ইচ্ছা রইল)।

বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রটি কবির মুসাবিদা করা অথবা মুসাবিদায় কবির প্রত্যক্ষ হাত ছিল মর্মে অনেকের ধারণা। এ বিষয়ে কবি তার সংশিস্নষ্টতার কথা অস্বীকার করেছেন। কবি তার নয় এবং তিনি কিছু জানেন না মর্মে পরবর্তীকালে তার 'কবি বরের প্রতিবাদ' শীর্ষক প্রতিবাদে উল্লেখ করেছেন। তথাপি বিষয়টি শাক দিয়ে মাছ ঢাকার প্রবণতা বলে অনেকে মনে করেন।

বিবাহের আড়ম্বর ও অভ্যাগতের পরিধি

যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে বিবাহের তারিখ ছিল জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষী। পারিবারিক কারণে আরো কদিন পিছিয়ে তারিখ স্থির হয়েছিল ৩রা আষাঢ়, ১৩২৮ মোতাবেক ১৭ই জুন, ১৯২৯, ১০ই সাওয়াল ১৩৩৯; রোজ শুক্রবার। সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছিল। গান গাইতে এসেছিলেন পাঁচ কিত্তার মরমী কবি ও বয়াতী শাহাবউদ্দিন, আব্দুল গফুর ও শাদু শাহ্। যন্ত্রসঙ্গীতের বহর নিয়ে এসেছিলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন ও তার ভাই ওস্তাদ আফতাব উদ্দিন। বাদ্যকর হিসেবে এসেছিলেন রামচন্দ্রপুরের খানেপাড়ার আলী নওয়াজ তুফানী ও তার সঙ্গে ২০ থেকে ২৫ জনের একটি বাদকগোষ্ঠী। নহবৎখানা করা হয়েছিল এ বিয়েতে।

www.nagorikpathagar.org

কুমিল্লা থেকে এসেছিলেন গুপ্ত পরিবারের এক বিরাট বহর। এদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতি বিরজা সুন্দরী দেবী, তার পুত্রবধূ কমলিনী সেনগুপ্তা, স্বামী ইন্দ্রকুমার, পুত্র বীরেন্দ্র, বীরেন্দ্রের জেঠিমা গিরিবালা সেনগুপ্তা, জেঠাতো বোন আশালতা সেনগুপ্তা, নিজ বোন কমলী, অঞ্জরী, মাসতুতো ভাই সন্তোষ ও নিজ পুত্র প্রবীর কুমারসহ অনেকে।

আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন– বাঙ্গুরার জমিদার রূপেন্দ্র লোচন মজুমদার, বাঙ্গুরা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অবনী মোহন মজুমদার, জমিদার রূপেন্দ্র লোচনের স্ত্রীসহ এলাকার আরো গণ্যমান্য হিন্দু-মুসলমান ব্যক্তিবর্গ।

নিমন্ত্রিত হিন্দু অতিথিদের জন্য পৃথক রান্না খাবার ব্যবস্থা ছিল। প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন খানরা। জানা যায়, তখনকার দিনে প্রায় ৪৫ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল বিয়েতে। এত বিপুল অর্থ ব্যয় ও জাঁকজমকপূর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ছিল রীতিমতো রাজ-রাজড়াদের কারবার। এ বিচারে কবি ভাগ্য ঈর্ষণীয় ছিল বৈকি।

বিবাহ বিভ্রাট

এত জাঁকজমকপূর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠানেও ঘটেছিল অনভিপ্রেত এক মহাবিভ্রাট। আর তা ঘটেছিল কাবিননামার একটি শর্ত নিয়ে। কাবিননামার একটি শর্তে নাকি উল্লেখ ছিল বিয়ের পর বর তার নববধূকে অন্যত্র নিয়ে বসবাস করতে পারবেন না। তাকে এখানেই ঘরজামাই হিসেবে থাকতে হবে। বিভ্রাটের কারণ নাকি এটাই।

এ শর্তে কবির আত্মঅহমে নাকি নিদারুণ আঘাত লেগেছিল। তাই এ শর্ত নিয়ে আলী আকবার খানের সহিত কবির বিতণ্ডার সূত্রপাত ঘটে। প্রথমে বাংলায় বিতণ্ডার সূচনা হয়। পরে উত্তেজিত অবস্থায় ইংরেজি বাংলায় চরম রূপ লাভ করে। বিয়ে ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়।

এক পর্যায়ে অভ্যাগত অতিথি সুধীজনের প্রয়াসে তাদের মধ্যস্থতায় একটি সমঝোতা লাভ করে এবং নির্বিঘ্নে বিবাহ সম্পন্ন হয়। তা সত্ত্বেও ঘরজামাই শব্দটি কবিকে বোঝানোই যায় নাই। অথবা অন্য কারো প্ররোচনায় বুঝেও বোঝেন নাই। কাবিননামাটি অবশ্য পাওয়া যায় নাই বিধায় শর্তটির অস্তিত্বও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে শর্তটির বিষয়ে পূর্বেই ভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছিল বলে জানা যায়। বিবাহ মজলিসে কবিকে উসকে দিয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিভ্রাট সৃষ্টি করা হয়েছিল। তার সম্যক তথ্য নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনার আশা রইলো।

বিয়ের বিয়াল্লিশ কথায় বিয়ে হয়েছিল। কাবিননামায় স্বাক্ষরিত হয়েছিল। দেনমোহর ধার্য হয়েছিল। ইজাব কবুল করা হয়েছিল। বিয়ে পড়িয়েছিলেন

www.nagorikpathagar.org

কনের ভাই মুন্সী আব্দুল জব্বার। উকিল হয়েছিলেন কনের বড় মামা আলতাফ আলী খান। বরের পক্ষে সাক্ষী হয়েছিলেন সাদত আলী মাস্টার আর কনের পক্ষে সাক্ষী হয়েছিলেন মুন্সী সৈয়দ আলী। দেনমোহর ধার্য হয়েছিল পঁচিশ হাজার টাকা।

কি আর ছিল বাঁকি? বাকি যা তাতো পর্দার অন্তরালে। পাঠক পরবর্তী আলোচনায় এ বিষয়ে আলোকপাত করবো।

প্রতীক্ষিত বাসর

স্বপ্নভরা বাসর মন্দির। জীবনের এক পরম মাহেন্দ্রক্ষণ। একটি রাত্রী একটি গৃহকোণ। একটি নর আর একটি নারীর প্রতীক্ষিত দুর্লভ মুহূর্ত। কম্পমান দুটি হৃদয়, উদ্বেল দুটি স্রোতধারার এক মোহনায় একীভূত হওয়ার চরম মুহূর্ত। অশান্ত দুটি কামনার্ত ও পিপাসার্ত হৃদয়ের সুশান্ত সমাধির পরম মুহূর্ত বটে! সংসার সমর অঙ্গনে প্রবেশের সিংহদ্বার এটি।

বাসরকে কেন্দ্র করে প্রতিটি নর ও নারী আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এঁকে থাকে শত ছবি। মনের গভীরে শত সহস্র বার সাজিয়ে তোলে তার স্বপ্নের বাসর। কেমন হবে তার সারা জীবনের সাথীটি? মনের গভীরে লুক্কায়িত স্বপ্নময় রাজ পুরুষের মতো হবে তো? এমনি একরাশ স্বপ্ন, লজ্জা আর সংকোচ নিয়ে দোদুল্যমান ভীরু পদক্ষেপে প্রবেশ করে স্বপ্নিল বাসর ঘরে। সবার হৃদয় নাচায়, স্বপ্নে মাতায়, ছন্দে দোলায় দ্বন্দ্বে ভাসায় বাসর ঘর। প্রথম রৌদ্রের মতো।

প্রতীক্ষিত বাসর মন্দিরে প্রবেশ করলেন কবি। তার প্রথম প্রিয়া, তার লাইলীর সান্নিধ্য প্রত্যাশায়। অবগুণ্ঠিতা লাজরাঙ্গা নববধূ দুরু-দুরু হৃদয়ে প্রহর গুনছে যেখানে, বাসর মন্দিরে। বাঁশ, বেত আর কাঠের নিপুণ কাজ করা বাসর ঘর। দুগ্ধ ফেনিভ প্রশস্ত শয্যা। সুগন্ধী আতর ছড়ানো, পুষ্প বিছানো সুসজ্জিত বাসর ঘর। নববধূ নার্গিস অধীর প্রতীক্ষায় তার হৃদয় রাজ্যের একচ্ছত্র রাজাধিরাজ এক দীনহীন কবি কিন্তু বাণী ও সুরের মূল্যে যিনি সাত রাজার ধন মানিক কাঞ্চন।

বাসর যামিনী শেষ প্রহর। পুবদিগন্তে সুবেহ সাদিকের পূর্বাভাস বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন কবি। বিগত রাত্রির বিভ্রাট-বিতণ্ডাজনিত কারণে বিপর্যস্ত কবি। প্রকাশ্য দিবালোকে এ মুখ তিনি দেখাবেন কেমন করে। তিনি লজ্জিত ও মর্মাহত।

পাশে লুণ্ঠিতা বিধ্বস্তা কবি প্রিয়া। ঘুমকাতুরা বালিকা বধূকে কবি চেয়ে চেয়ে দেখছেন। এইতো ঘুমে বিভোলা তার লাইলী। যাকে পাওয়ার জন্য এত ঘাত-প্রতিঘাত, এত বিতণ্ডা-বিভ্রাট। এইতো তার কুড়িয়ে পাওয়া কোহিনূর।

www.nagorikpathagar.org

তার আর কি চাই? বিজেতার স্পর্ধায় ভরে উঠে কবির হৃদয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কবি কলকাতায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

বাজে বিদায় রাগিনী বাজে

প্রভাতের সৌম্য নিস্তব্ধ চরাচর। চিন্তিত কবি। পাশে গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন কবি প্রিয়া। নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে ফুলে ফুলে উঠছে প্রিয়ার মদির দেহ বল্লরী। আপন অজান্তে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠে কবির ঠোঁটে। আবেশে কাছে টেনে নেয় প্রিয়াকে। গুণগুণিয়ে গেয়ে উঠেন কবি–

কত নিদ্রা যাওগো কন্যা জাগো একটুখানি
যাবার বেলায় শুনিয়া যাই তোমার মুখের বাণী
নিশিথীনির ঘুম ভেঙে যায়
চন্দ্র যখন হেসে তাকায়
চাতকিনী ঘুমায় কি গো দেখলে মেঘের পানি।

কবি সোহাগ ভরে হাত বুলালেন প্রিয়ার ঘন কেশদামে। একটু ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকলেন, সখী- ওঠো, কথা কও? আধো জাগরণে আধো বোঁজা চোখে মধুর হেসে কবির বিশাল বুকের গভীরে লুকাতে লুকাতে বিড়বিড় করে বলে উঠলো প্রিয়া–

দেখো পাছে মোরে ঘুম ভাঙ্গিয়াই
ঘুম না টুটিতে যাই তবে যাই।
(চক্রবাক)

কবি প্রিয়াকে বুকের আরো গভীরে টেনে নিয়ে বলেন, সই চলো আমরা কলকাতা যাই। ডাগর চোখ তুলে কবির মুখের প্রতি তাকালো প্রিয়া, সে অনেকক্ষণ। তারপর শান্ত কণ্ঠে বলে উঠলো, বাসর রাতে বর কনে উধাও? তাও কি হয়?

কেন হয় না? উত্তর দিলেন কবি। আরো বললেন, ধর্মত তুমি আমার স্ত্রী। আমি তোমার স্বামী। আমার সাথে যেতে আপত্তি কেন? ঘুমের ঘোরেও কবি চিত্তের দৃঢ়তা বুঝতে বাঁকি রইলো না প্রিয়ার। শয্যায় উঠে বসলেন তিনি। কান্নাকাতর মিনতি ভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, ওগো পায়ে ধরি, অমন করে যেতে চেয়ো না। আর কটা দিন থেকে যাও? দুজন এক সাথে যাবো।

ঠিক এ সময় কেঁদে উঠলো ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের বেহালার প্রভাতী রেওয়াজ–

www.nagorikpathagar.org

তুমি আর একটি দিন থাকো
হে চঞ্চল, যাবার আগে
মোর মিনতি রাখো।

নতুন সূর্যোদয়কে স্বাগত জানিয়ে থেমে গেলো নহবৎ খানার প্রথম রেওয়াজ। প্রভাতের শান্ত চরাচর সহসা গুমরে কেঁদে উঠেছিল যেন। এখন তারি হা-হুতাশ আর বিদায় বিধুর বিলাপ ধুন তুলে যায়। কবি প্রিয়ার আঁখিজল টলমল করছিল। সেদিকে চোখ রেখে কবি বলে উঠলো- ও বুঝেছি, যাবে না, সেটা তোমার ছল। কবি প্রিয়া বোঝাবার শত চেষ্টায় অস্ফুট কণ্ঠে বোবা হয়ে নিষ্পলক নেত্রে কবির প্রতি নির্ণিমেষ চেয়ে রইলেন।

বাইরে তখনও বেজে চলেছে সানাই। বিদায় বিধুর বিলাপ সুরে। যেন কোন ক্রন্দসী ঝুরে ঝুরে কাঁদছে। বিশ্ব চরাচর সে কান্না কাতর সুরে মথিত ও ব্যথিত। বড় বিষাদময় সে মূর্ছনা। বিলাপ রাগিনী−

মোর না মিটিতে সাধ, না মিটিতে আশা
ভাঙ্গলো মেলা।

সহসা থেমে গেল সে সানাই। বিরতি ঘটলো ক্রন্দসীর বুক ফাঁটা কান্নার। কবির চোখে জল। কবি প্রিয়ার আঁখি টলমল। কান্না ব্যাকুল কবি প্রিয়া কবির পা দুখানি বুকের গভীরে জড়িয়ে ধরে আকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন, ওগো বিশ্বাস করো, আমি ছল করিনি। আমার মিনতি রাখো, আর কটা দিন থেকে যাও। আমিও তোমার সঙ্গে যাব। বেদীমূলে নিবেদন ফুল যেমন দেবতাকে তুলে দেয়া হয়, তেমনি পদতলে লুণ্ঠিতা কবি প্রিয়াকে বুকে তুলে নিলেন কবি। আদর করে বললেন, ঠিক আছে তুমি যেতে চাওনা, যেওনা। আমাকে কিন্তু যেতেই হবে। কবি প্রিয়া জানতে চাইলেন, আবার কবে আসবে? পরের মাসে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে- উত্তর দিলেন কবি। বাড়ি থেকে আত্মীয়-স্বজন এনে তোমাকে নিয়ে যাব। বললেন কবি।

ক্লান্তি আচ্ছন্ন কবি শয্যায় শায়িত হলেন। কবির পা দুখানি বুকে ধরে চুমায় চুমায় সিক্ত করতে লাগলেন কবি প্রিয়া। এ সময় নহবৎ খানায় বাঁশির সুর বেঁজে উঠলো−

নিশি না পোহাতে যেয়ো না, যেয়ো না
দীপ নিভিতে দাও
নিবুনিবু প্রদীপ নিবুক হে পথিক
ক্ষণিক থাকিয়া যাও।

www.nagorikpathagar.org

রাত্রি যেন বিদায় চাইছে। আগমনী বাজছে নতুন দিনের। এমন রাত্রিকে বিদায় জানাতে কষ্ট হচ্ছিল প্রকৃতির। বিলম্বিত টানে সমাপ্তি ঘটলো বাঁশির সুর। শেফালীর চোখ থেকে ঝরে পড়লো কয়েক ফোটা শিশির। প্রিয়ার চোখেও ঝরতে লাগলো উষ্ণ আঁখিজল।

দাও বিদায়

ঘুমে বিভোল বধূ প্রিয়াকে ঘুমিয়ে রেখে বাসর মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন কবি। সূর্য তখন উঠি উঠি। স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম সেরে নাস্তা করলেন। তারপর শুরু করলেন বিদায়ের পালা। একে একে সবার কাছ থেকে বিদায় নিলেন তিনি। কেবল বন্ধু ও মামা শ্বশুর আলী আকবার খানের নিকট থেকে বিদায় চাইতে পারলেন না। একরাশ লজ্জা ও সংকোচ তাকে বিরত করে রাখলো।

মাতৃপ্রতিম খালা শাশুড়ি এখতারুন নেসার নিকট গেলেন সবার শেষে। বললেন মা, জরুরি কাজে কলকাতায় যেতে হচ্ছে। এবার তোমার ছেলেকে বিদায় দাও। আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে তিনি বললেন, আবার কবে আসবে বাবা? সামনের মাসে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে। দিন তারিখ ঠিক করে নার্গিসকে কলকাতায় নিয়ে যাব। এ ক'টা দিন ও এখানেই থাক। বললেন কবি। এখতারুন নেসা কথা বাড়ালেন না। ভারি গলায় বললেন, তাই হবে বাবা তাই হবে। তুমি যেমন চাইবে সে মতোই হবে।

বিদায় পর্ব শেষ করলেন কবি। খান ভাতৃগণ আর আপত্তি তুললেন না। কুমিল্লা হতে আগত বীরেন্দ্র কুমারের সঙ্গে কুমিল্লার পথে পা বাড়ালেন কবি। পারিবারিক রেওয়াজ মতো মামা শ্বশুর মেজাবত আলী খান ও সাদত আলী মাস্টার কবিকে কোম্পানীগঞ্জ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এলেন। যাবার সময় নহবৎ খানায় বাজছিল কবির লেখা গানের সুর–

আমার যাবার সময় হলো দাও বিদায়
মোছো আঁখি দুয়ার খোলো দাও বিদায়
ডাকে তারা ডাকে সাথি আয়রে আয়
সজল করুণ নয়ন তোলো দাও বিদায়।

সারা অন্তরজুড়ে হাহাকার তোলে। দৌলতপুরের আড়াই মাসের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসে। নববধূ প্রিয়ার মিনতি কান্নার ঝংকার তোলে কবির কানে। কৃষাণের গানে, জেলেদের প্রাণের সুরে, রাখালের বাঁশিতে কবি প্রিয়ার মিনতি ব্যথা সুর হয়ে কবিকে উন্মুখ করে তোলে। কবির কেবলই মনে হচ্ছে তিনি

www.nagorikpathagar.org

যেন কিছু ফেলে গেলেন? এই কিছু যে কি? তাই তিনি ভেবে পাচ্ছেন না। লাঙ্গল কাঁধে এক কৃষাণ মাঠে যাচ্ছে। তার মুখে গান। কবি কান পেতে সে গান শুনছে–

ওরে বিভুল
তবু ভাঙ্গলো না তোর ভুল
ভাঙ্গলো রে তোর আশার প্রাসাদ
ভাঙ্গলো প্রেম পুতুল।

কবি ভাবছে, তার বিবেক যেন এ গান গাইছে। কোথায় যেন তার মহাভুল হয়ে গেছে।

কে যেন পিছু ডাকে

পথ চলেছেন কবি। এবারের পান্থসারথী শ্রীমান বীরেন্দ্র কুমার। গ্রামছাড়া রাঙ্গা মাটির পথ। দিগন্ত জোড়া মাঠ। মাঝে মাঝে ছোট নদী, খাল বিল। গানের দেশ, প্রাণের দেশ কুমিল্লা। গান আর প্রাণের উৎস খনি এখানে। কৃষকের, মাঝিদের, জেলেদের, রাখালের মুখে হৃদয় উজাড় করা গান। কেবল গান আর গান।

সূর্য অনেকটা উঠে গেছে ইতোমধ্যে। আনমনে পথ চলছেন তিনি। সারা অন্তরজুড়ে তার স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্নের লুকোচুরি খেলা। অন্তরের পর্দায় উঁকি দিচ্ছে দৌলতপুর, দৌলতপুরের আড়াই মাস। নানা কথা, নানা স্মৃতি মনে পড়ছে কবির। স্মৃতির দোলায় যুগপৎ কখন মুখে ফুটে উঠেছে হাসি, কখনো বিষাদিত ছায়া। কেউ বোঝে না, বুঝতে পারবে না এ হাসি-কান্নার উৎস কত বিধুর। বুঝবে কি করে? বন যখন পোড়ে তখন সবাই দেখে। মন যখন পোড়ে সবাই কি দেখতে পায়? পোড়ে কবির মন। সে শুধু ভুক্তভোগী ছাড়া আর কে বুঝবে?

কবির অন্তর আকাশজুড়ে তোলপাড় তোলে গত রাতের কথা। সেই বিভ্রাট-বিতণ্ডা, সেই বিবাহ-বাসর, নববধূর ভরাট দেহ, সেই বধূর চোখের জল। সে কথা স্মরণ করে কবির দু'চোখ জলে ভরে যায়। পথ ঝাপসা হয়ে আসে। কয়েক ফোটা ঝরেও পড়ে। সামলে নেয় কবি আড়াল করে, যাতে পথসঙ্গী বুঝতে না পারে। স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্নের দোলাচলে পথ চলেছেন কবি।

সহসা কার যেন পিছু ডাক শুনতে পান। চমকে উঠেন কবি। পেছন ফিরে তাকান। তার বধূ প্রিয়া পিছু পিছু ছুটে আসছে নাতো? ওই যে দূরে

www.nagorikpathagar.org

সবুজ ঘেরা গাঁ দৌলতপুর। সবুজ কলা গাছের পাশে সবুজ বসনা বধূ হাতছানিতে ডাকছে। আয়, ফিরে আয় পলাতক। যাসনে অমন করে অভিমানী।

কবির অন্তর আকাশজুড়ে নববধূ নার্গিস। যেদিকে তাকান, সেদিকেই তার জল ছল ছল মুখখানি দেখতে পান কবি। কবি ভাবেন, এতক্ষণে হয়ত ঘুম ভেঙ্গেছে প্রিয়ার। জেগে দেখবে তার কবি নাই। বেদনায় ভেঙ্গে যাবে তার বুক। দু'নয়নে জল ভরে উঠবে তার।

নব প্রভাতে, নব উদ্যোমে পাল খাটিয়েছে মাঝি। সপ্তবর্ণা পাল তার। তাতে জোর হাওয়া লেগেছে। শন-শন বেগে ছুটে চলেছে নৌকা। গলুইয়ে বসে শক্ত হাতে হাল ধরেছে বুড়ো মাঝি। মুখে তার রক্ত গলা গান–

হে মায়াবী, বলে যাও,
কেন দখিনা হাওয়ার মতো
ফুল ফুটিয়ে চলে যাও।
কেন ফাগুন এনে, আনো বৈশাখী ঝড়,
কেন মন নিয়ে, মনে রাখ না মনোহর।
কেন মালা গেঁথে বুকে তুলে
পায়ে দলে যাও।

কুমোরপাড়ার মধ্য দিয়ে চলেছেন কবি। পথের পাশে কুমোরের চাকা ঘোরে। জাদুর পরশে মূর্তিময় হয় নানা রঙ্গের হাঁড়ি-পাতিল। গভীর মনোযোগে জাদুকরি পরশে বুলাতে বুলাতে গড়ে তোলে রং বেরংয়ের তৈষজ। তার মুখেও গান। কবি কান পেতে শোনেন সে গান–

প্রিয় যেন প্রেম ভুলো না।
এ মিনতি করি হে,
হৃদয় কারেও নাহি দিও
আমারে বিস্মরি হে।

পাশ কেটে চলে যান কবি। পাশে পাশে বয়ে যায় বুড়িনদী এঁকে বেঁকে। পথের যেন শেষ নাই। পথের কি শেষ আছে? নদীর কূলে চরে গরুর পাল। অদূরে বুড়া বটমূলে বসে রাখাল বাঁশিতে ধুন তুলেছে। বড় করুণ সে সুর–

www.nagorikpathagar.org

স্বপন যখন ভাঙ্গবে তোমার
দেখবে আমি নাই
শূন্য তোমার বুকের কাছে
মোরে খুঁজবে গো বৃথায়।

দেখবে জেগে বাহুর পরে
আছে আমার অশ্রু ঝরে
কাছে থেকেও ছিলাম দূরে
যাই গো চলে যাই।

পৌছে গেলেন কবি কুমিল্লায়। গানের দেশের গানের ভাষা তার হৃদয়ের ভাষা হয়ে বাজতে লাগলো। এ যেন কবির বিবেকের ভাষা। কুমিল্লার মাঠ, ঘাট, প্রান্তর এত কথা জানে? কে জানে আর কোনোদিন এ পথে আসা হবে কিনা। কে জানবে এই পথে আর কোনোদিন আসবে কিনা কবি। তার প্রিয়ার নিকুঞ্জ নীড়ে, দৌলতপুরে।

প্রথম প্রিয়ার প্রথম বিরহ

নিদ্রা ভাঙ্গলো প্রিয়ার সে অনেক বেলায়। চোখ মেলে দেখলো শয্যা শূন্য। কবি নাই। একটা নিদারুণ শূন্যতা হৃদয়ে হাহাকার তুললো। গত রাতের কথা মনে পড়ে গেল। নিদ্রাচ্ছন্ন প্রিয়া তখন বুঝে উঠতে পারেনি। মনে মনে শঙ্কা জাগে, তবে কি সত্যি কবি চলে গেছেন। বাহিরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরছে। নহবৎ খানা থেকে আসছে বৃষ্টি সিক্ত গানের সুর–

কোন সুদূরের চেনা বাঁশির ডাক শুনেছিস ওরে চখা
ওরে আমার পলাতকা।

চকিত হয়ে উঠেন প্রিয়া। প্রিয়হারার ভীতি জাগে হৃদয়ে। গানের বাণী তাকে উদ্বেল করে তোলে। কশাঘাতের মতো প্রিয়া সচকিত হয়ে উঠেন। আপন মনের এ যেন সবাক উত্তর। লাজ রাঙ্গা বধূ প্রিয়া স্বলাজ চাহনীতে এদিক ওদিক দেখে নেয়। লজ্জা ও সংকোচ তাকে রক্তরাঙ্গা করে তুললো। কোথাও কবির অস্তিত্ব অনুভব হলো না।

দুরু দুরু পদক্ষেপে হেঁসেলের দিকে গেলেন প্রিয়া। উঁকি দিয়ে দেখলেন তার মা ও খালা গালে হাত দিয়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে চলেছেন। বুঝতে বাঁকি রইলো না প্রিয়ার। বাসর রাতে বর পলায়ন। এ অমঙ্গলের লক্ষণ।

www.nagorikpathagar.org

অশ্রুপাতের কারণ এটাই। তবু অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, কবি কোথায় মা?

খানিক বিলম্বে একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন উভয়ে। আঁচলে বার কয়েক অশ্রুধারা মুছে নিলেন খালা। আদ্র কণ্ঠে বললেন, সে তো কলকাতায় চলে গেছে মা। শোনামাত্র চিৎকার দিয়ে উঠলো প্রিয়া। না এ হতে পারে না। বলে তীর বেগে ছুটে গেলেন বাসর মন্দিরে। শয্যায় আছড়ে পড়লেন। দু'হাতে শয্যা আঁকড়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

এ কান্নার যেন শেষ নেই। অন্তহীন সে কান্না। প্রিয়হারা কিশোরী বধূর বুকভাঙ্গা কান্না। শয্যার উপর ফুলে ফুলে কাঁদছে প্রিয়া। কিশোরীর বিরাগ-বিধুর কান্নায় চারদিক বিষাদময় হয়ে উঠলো। কিশোরীর কান্নার সাথে তাল মিলিয়ে শুরু হয়ে গেল আষাঢ়ের ঝমঝম বৃষ্টি। বিরামহীন বৃষ্টিরও যেন সমাপ্তি নাই। বিরতিহীন একটানা বৃষ্টি সজল মেঘের অন্তহীন ডাকাডাকি। নহবৎ খানা হতে ভেসে আসতে লাগলো বৃষ্টি ভেজা সুরের ব্যথাদীর্ন তরঙ্গ−

সজল হাওয়া কেঁদে বেড়ায়
কাজল আকাশ ছেয়ে
তুমি এসো ফিরে
আকাশ কাঁদে, আমি কাঁদি
বাতাস কাঁদে সারা
তুমি কোথায়, কোথায় তুমি
পথিক পথহারা
উঠছে কাঁদন, ভাঙ্গন ধরা
নদীর তীরে তীরে
তুমি এসো ফিরে।

সজল মেঘমালার অবিশ্রান্ত বর্ষণ, বৃষ্টিভেজা সুর তরঙ্গ আর প্রিয়ার আঁখিজল একাকার হয়ে গেল। বাহিরের বর্ষণ কিছুটা স্তিমিত হয়ে গেলেও প্রিয়ার আঁখিজল বাঁধ মানে না। সিক্ত হলো বাসি বাসর শয্যা। বাহিরে গুমোট গুমোট ভাব। মেঘমালার চাপা গোঙানী বৃষ্টি হবে বুঝি আবার।

কিশোরী বধূর চোখ জলভরা। ভাঙ্গা বুকে অনেক ভাবনা উঁকি দিচ্ছে তার। কেন তিনি ঘুমিয়েছিলেন। পোড়া ঘুম তার সর্বনাশ করেছে। মরণ ঘুম তার স্বপ্ন কেড়ে নিয়েছে। তার আশার ইমারত ধসে পড়েছে। কোন চোরাবালির চরে ঘেরা পড়েছেন তিনি। এ সময় নহবৎ খানা থেকে ভেসে আসছে বৃষ্টি সিক্ত জল তরঙ্গ−

www.nagorikpathagar.org

ব্যথার সাগর পানি ঘেরা
চোরাবালির চর
ওরে পাগল, কে বেঁধেছিস
সেই চরে তোরা ঘর।

বিধুরা বালিকা বধূ কাঁদে। কিশোরীর চোখে এত জল? কে জানতো আগে? সহসা কার স্নেহ পরশ পড়লো প্রিয়ার মাথায়। খালার কমল স্পর্শ। দুঃখিনী প্রিয়ার কান্নার সাগর উথলে উঠলো যেন। খোঁচা লাগলো যেন পুরাতন বেদনাদায়ক ক্ষতে। আদর করে খালা বললেন, ছিঃ মা! কাঁদে না। এইতো শ্রাবণে নজু এসে তোকে কলকাতায় নিয়ে যাবে। ধৈর্য ধর মা।

গুমরে ওঠেন প্রিয়া। তপ্ত কড়াইয়ে খালা ফোঁড়ন দিলেন যেন। কেবল কান্না আর কান্না। কান্নার বিরতি নাই। প্রিয়ার কাঁদনে খালাও কাঁদেন। উভয়ের কাঁদনে গুমোট পরিবেশ আরো গুমোট হয়ে আসে। খালার গলা জড়িয়ে প্রিয়া কাঁদেন। অনেকক্ষণ পর কান্নার বেগ স্তিমিত হয়ে আসে। তারপর চলে বাষ্পরুদ্ধ কান্না প্রতিরোধের প্রাণান্ত প্রচেষ্টা।

এক সময় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে প্রিয়া বলেন, আমি বড় হতভাগী মা। শিশুকালে তোমরা আমার মুখে বিষ ঢেলে দিয়ে মারনি কেন? সেই ভালো হতো মা? সেই ভালো হতো। খালা কোমল হাতের পরশ বুলাতে বুলাতে বলেন, ছিঃ অমন কথা মুখে আনতে নাই মা। অমঙ্গল হবে। ধৈর্য ধর মা, ধৈর্য ধর।

কেমন করে ধৈর্য ধরবো মা। বাসর রাতে বর পলায়ন। এ অপবাদ আমি ঢাকবো কেমন করে। কত মিনতি করে বললাম তবুও পাষাণ শুনলো না। চলেই গেল। কান্না কাতর কণ্ঠে জবাব দিলেন প্রিয়া।

অনেকক্ষণ নীরব থেকে স্বাভাবিক স্বরে প্রিয়া বললেন, এসো মা তোমাকে আমার কবির কবিতা শোনাই। আমার জন্য কবি কবিতা লিখেছেন। এমনটি যে ঘটবে, কবি তা জানতেন। নইলে এমন করে লিখবেন কেন? আবেগে উৎসাহ দিয়ে খালা বলে উঠলেন, আমার নজুর কবিতা শোনাবি। নজু সুন্দর, সুন্দর কবিতা লিখতো। তার 'পুবের হাওয়া' আমাকে উৎসর্গ করেছিল। ওকে আমার খু-উ-ব ভালো লাগে মা। নজু আমাদের কোনোদিন ভুলে যেতে পারবে না, দেখিস। সামনে শ্রাবণে ও নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো খালা। খালার কোলে বসে কবির কবিতা শোনাতে থাকেন প্রিয়া–

পথ ভুলে যে এসেছিল সে মোর সাধের রাজভিখারী
মাগো আমি ভিখারিণী, আমি কি তাই চিনতে পারি?
তাই মাগো তার পূজার ডালা

www.nagorikpathagar.org

নিইনি, নিইনি মণির মালা
দেবতা আমার নিজে আমায় পুজলো ষোড়শ উপাচারে
পূজারিকে চিনলাম না মা, পূজা ধুপের অন্ধকারে

সে যে পথের চির পথিক তার কি সহে ঘরের মায়া
দূর হতে মা দূরান্তরে ডাকে তারে পথের ছায়া
মাঠের পরে বনের মাঝে
চপল তাহার নূপুর বাজে
ফুলের সাথে ফুটে বেড়ায় মেঘের সাথে যায় পাহাড়ে
ধরা দিয়েও দেয় না ধরা জানি না সে চায় কাহারে

মাগো আমার শক্তি কোথায় পথ আগলে ধরে রাখার
তার তরে নয় ভালোবাসা সন্ধ্যাপ্রদীপ ঘরে ডাকার
তাই মা আমার বুকের কপাট
খুলতে নাড়ল তার করাঘাত
এ মন তখন কেমন যেন বাসতো ভালো আর কাহারে
আমিই দূরে ঠেলে দিলাম অভিমানী ঘর হারারে

আজ পেলে তায় হুমড়ি খেয়ে পড়তুম মা যুগল পদে
বুকে ধরে পদ কোক নাদ স্নান করিতাম আঁখির হ্রদে
বসতে দিতাম আধেক আঁচল
সজল চোখের চোখ ভরা জল
ভেজা কাজল মুছাতাম তার চোখে মুখে অধর ধারে
আকুল কেশে পা ধোয়াতাম বেঁধে বাহুর কারাগারে।

ঝুমে আসে বাদল আকাশ। ঝর ঝর মুক্তা ধারার মতো ঝরে ঝরে পড়ে বৃষ্টি। সাথে সাথে ঝরে প্রিয়ার অবুঝ হৃদয়। দু'চোখ বেয়ে ঝরে বেদনাশ্রু। আঁচলপ্রান্ত দিয়ে নিজের দু'চোখ মুছে কাজের তাগিদে উঠে যান খালা। যেতে যেতে বলেন, আর কাঁদিস না মা। ভাত বেড়ে রেখেছি। খাবি আয়।

শয্যায় লুটে পড়ে প্রিয়া। ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকেন। দুয়ারের চৌকাঠে পা রেখে আবার ফিরে আসেন খালা। বিরহিণী কিশোরীর দুঃখে সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করেন। স্বস্নেহে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেন, ওমন করে কাঁদে না মা। ধৈর্য ধর। সামনের শ্রাবণে নজু এসে তোকে নিয়ে যাবে। লাল বেনারসে টুকটুকে বৌ সেজে তুই কলকাতা যাবি। কি মজাই না হবে। উত্তর

www.nagorikpathagar.org

দেয় না প্রিয়া। খালা চলে যান। যেতে যেতে আবার বলে যান খাবি আয়, খাবার ঠাণ্ডা হলো যে।

প্রিয়া যেমন ছিল তেমনি রইলেন। হৃদয়ের অতল গভীর হতে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মাত্র। মনে মনে ভাবছেন, তার মতো হতভাগী আর কে আছে? তার নারীত্বের ওপর শত ধিক্কার। নববৎ খানায় তখনো বেজে চলছে–

শূন্য এ বুকে পাখি মোর
আয়, ফিরে আয়
তোরে না হেরিয়া সকালের ফুল
অকালে ঝরিয়া যায়।

অল্প বয়সী বধূর প্রথম বিরহ

একে তো কিশোরী বধূ তাতে প্রথম বিরহ। এ বিরহ তাকে কাঁদায়। নয়ন জ্বলে বুক ভাসায়। পুতুল খেলায় মন বসে না তার। দূরে ছুঁড়ে মারে শখের খেলনা। উদাস নেত্রে চেয়ে থাকে দূর বন ছায়ায়। কখন চঞ্চলা হরিণীর মতো সচকিত হয়ে উঠে, এই বুঝি তার কবি ফিরে আসছেন। এসে তাকে বউ বলে ডাকবেন। অশ্রুধারা মুছে দিয়ে বুকে তুলে নেবেন। গুমরে কেঁদে ওঠে প্রিয়ার অবুঝ মন। কানায় কানায় উতরায় বিরহ বেদনার তপ্ত আঁখিজল। লুটে পড়ে শূন্য শয্যায়। উৎকর্ণ হয়ে শোনে নহবৎ খানার এস্রাজের বোল–

পরো সখি মধুর বধূর বেশ
বাঁধা আকুল চাঁচর কেশ
বাঁকা ভুরুর মাঝে পরো খয়েরী টিপ
বকুল বেলার হার
ছাড়ো মলিন বাস শাড়ি চাপা রঙ
পরো পরো আবার
অধর রাঙ্গাও স্বলাজ হাসিতে
মোছ নয়ন ধার
বিদেশি বন্ধু তোমারে স্মরিয়া ফিরে এলো নিজ দেশ।

কাটে সকাল আসে দুপুর। বিরহ কাতর প্রিয়া। অন্তরে জাগে তার নিরাশার অন্তহীন জিজ্ঞাসা। কোথায় যাবে, কোথায় গেলে কবির দেখা পাবে ভেবে পায় না প্রিয়া। প্রিয়জন পাওয়ার আকুতি আরাধনা সে তো মানুষের সহজাত। কবির কি সেসব নাই? মনে মনে খুঁজতে থাকেন প্রিয়া। পেয়েও যায়। প্রিয়া যে

www.nagorikpathagar.org

আগুনে দহে, সেই একই দহনে দগ্ধ কবিও। সেই আকুতির বিন্যাস ঘটিয়েছেন কবি তার লেখনিতে–

অলস দুপুর মোর কাটে না তো একা
ঝরে যায় চন্দনপত্র লেখা
কখন আসিবে চাঁদ নভে
মিটিবে আমার তৃষ্ণা কবে
তৃষ্ণায় মূর্ছিতা চাতকী
কোথা তার ঘন শ্যাম বলে দাও।

দুপুর গড়িয়ে যায়। আসে সন্ধ্যা। তখনো কবি ফিরে আসে না। শূন্যতা হাহাকার তোলে প্রিয়ার হৃদয়ে–

উদাস দুপুর কখন গেছে, এবার বিকাল যায়
ঘুম পাড়ানী ঘুমতী নদীর ঘংঘুর পরা পায়
শঙ্ক বাজে মন্দিরে
সন্ধ্যা আসে মন ঘিরে
ঝাউয়ের ডগায় ভেজা আঁধার কে পেঁজেছে হায়
মাঠের বাঁশি মন উদাসী ভীম পলাশী গায়

দিনের পর আসে রাত। প্রতীক্ষা বিনিদ্র বিরহী রাত। বেদনা বিধুর দুঃসহ রাত্রী একা কাটে প্রিয়ার। দ্বার খুলে রাখে প্রিয়া। যদি কবি আসে, এসে ফিরে যায়। প্রহর গুনে প্রহর কাটে তার–

নয়নে নিঁদ নাহি
নিশীথে প্রহর জাগি একাকিনী গান গাহি
কোথা তুমি কোন দূরে ফিরিয়া কি আসিবে না
তোমার সাজানো বাগানে ফুটিয়া ঝরিল হেনা
কত মালা গাঁথি কত আর পথ চাহি
কত আশা অনুরাগে হৃদয় দেউলে রেখে
পুজিনু তোমারে পাষাণ কাঁদিলাম ডেকে ডেকে
এস অভিমানী ফিরে নিরাশার এ তিমিরে
চাঁদের তরণী বাহি ॥

www.nagorikpathagar.org

নিশি গভীর থেকে আরো গভীর হয়। তবু ফিরে আসে না কবি। প্রিয়ার নিঁদহারা চোখে জাগে অশ্রুর বন্যা। মনে পড়ে যায় কবির আর একটি গানের কলি। গুণগুণিয়ে ধুন তোলেন প্রিয়া–

নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে
হে প্রিয়, কোথা তুমি দূর প্রবাসে
বিহগী ঘুমায় বিহগ কোলে
শুকাইছে ফুলমালা প্রান্ত আঁচলে
ঘুমায় রাতের তারা চাঁদের পাশে
ফুরায় দিনের কাজ, ফুরায় না রাতি
শিয়রের দ্বীপ হায়
অভিমানে নিভে যায়
নিভিতে চাহেনা নয়নের বাতি
কহিতে পারি না কথা মেলিয়া আঁখি
বিষাদ মাখা মুখ গুণ্ঠনে ঢাকি
দিন যায় দিন গুনে, নিশি নিরাশে।

দূর বিপিনে পাপিয়া পুকারে। পিয়া বিরহে পাপিয়া ঝুরে ঝুরে কাঁদে। কাঁদায় উতল নিশি, মাতায় বিষন্ন বন। সাথে কাঁদে প্রিয়ার অবুঝ মন। চোখে আসে জল ভরে–

পিয়া পিয়া পিয়া পাপিয়া পুকারে
চোখ গেলে বিরহিণী বধূর মনের কথা
কাঁদিয়া বেড়ায় বাদল আঁধারে
প্রথম বিরহ অল্প বয়সী
ভুলি গৃহকাজ রহে বাতায়নে বসি
পাখির পিয়া স্বর বুকে তার তোলে ঝড়
অঞ্চলে আঁখি জল মোছে বারে বারে ॥

পরেনি বেশ বাঁধেনি কেশ
স্লানমুখী দীপালিকা
নীরব দেহে যেন শুকায়ে যায় ওগো
মালতীর মালিকা
বনের বিহগ ছাড়ি বিহগিরে
যায় না বিদেশে থাকে সুখনীড়ে

www.nagorikpathagar.org

বলো কেমনে ওগো প্রেমের দেবতা
বিরহ্ দাহ্ সহি হিয়ার মাঝারে।

বাইরে মাতাল বরষা রাত। বাতায়নে চোখ রেখে একাকী বসে থাকে প্রিয়া। কত কথা মনে পড়ে তার। এই তো কাল কবি এখানে ছিলেন। আজ নাই। মনে পড়ে গত রাতের কথা। মনে পড়ে যায় কবির ব্যাকুল মাতাল চুম্বনের কথা। আপন অজান্তে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠে অধর পটে। এত দুঃখের মাঝেও সে সুখ স্মৃতি প্রিয়ার মনে অনাবিল আনন্দ জোগায়। সেই সুখের সুরভীতে ঘুম আসে না প্রিয়ার–

পোড়া চোখে জল ফুরায় না কেমন করে আসবে ঘুম
মনে পড়ে শুধু তোমার পাতাল গভীর মাতাল চুম
কেমন করে আসবে ঘুম।

প্রহরে প্রহরে সুড়সুড়ি দিয়ে যায় রাত জাগা নিশাচর পাখি। সবার উপর উতল করা বরষা রাত। শূন্য পালঙ্ক শয্যা। একে তো সরলা বিভোলা বালিকা, তাতে প্রথম বিরহ নিশি। বেদনা বিহ্বলা কিশোরী আঁখিজল চেপে রাখতে পারে না–

কেমনে রাখি বলো আঁখি বারি চাপিয়া
রাতে কোকিল ডাকে ডাকে নিশীথে পাপিয়া
কেমনে রাখি বলো আঁখি বারি চাপিয়া।

প্রিয়া মনে মনে ভাবেন, ঘুমের ঘোরে কিছু বলেই ফেলেছি। তাই কবিকে চলে যেতে হবে। এত অভিমান কবির। কবি এত কিছু বোঝেন, বোঝেন না প্রিয়া জীবনের কত ফুল থরে থরে সাজিয়ে রেখেছে কবিকে উজাড় করে দেবে বলে। কবি সে ফুল না নিয়ে কেবল ভুলগুলো নিয়ে চলে গেলেন। সেই শোচনায় প্রিয়া ব্যাকুল–

মোর ফুল বনে ছিল যত ফুল
ভরি ডালি দিনু ঢালি দেবতা মোর
হায় নিলে না সে ফুল ছিঃ ছিঃ বেভুল
নিলে তুলি খোপা খুলি কুসুম ডোর
স্বপনে কি যে কয়েছি তায় গিয়াছ চলি
জাগিয়া কেঁদে ডাকি দেবতায়
প্রিয়তম, প্রিয়তম, প্রিয়তম ॥

www.nagorikpathagar.org

প্রিয়া মান করেছিল। নববধূর মান-অভিমান থাকতেই পারে। সেই অভিমানে কবি চলে গেলেন? বাড়ির কেউ কি কবিকে ফেরাতে পারেনি? সবার উপর রাগ হয় প্রিয়ার। প্রিয়া রাগে ও দুঃখে কেঁদে ফেলেন। এ মান-অভিমানের তুচ্ছ বিষয় নিয়েও কবিতা লিখেছেন কবি–

সখী আমি না হয় মান করেছিনু
তোরা তো সকলে ছিলি
ফিরে গেলো হরি, তোরা পায়ে ধরি
কেন নাহি ফিরাইলি।

প্রিয়া অবলা সরলা পল্লী বালা। ছলা-কলা কিছুই জানে না। তাই এ পথে অনায়াসে কবি এসেছেন, চলেও গেছেন। তার হৃদয় দুয়ার কবির জন্য অবারিত। প্রিয়া এবার প্রতিজ্ঞা করেন, আর তিনি দ্বার খুলে রাখবেন না। কবি ফিরে এলে এবার তাকে তার হৃদয়ের ভাণ্ডার ঘরে বন্দি করে রাখবেন। কখনো ছেড়ে দেবেন না–

আমি দ্বার খুলে আর রাখবো না
পালিয়ে যাবে সে
ঠাকুর তোমায় বন্দি করে
রাখবো আমার ভাড়ার ঘরে
একবার পেলে ছাড়া বাঁধনহারা
পালিয়ে যাবে যে।

আশা নিরাশায় কেটে যায় প্রিয়ার একটি বিরহ দিন, একটি বিধুর রাত। তার চোখের জলের ঝাপসা আলোয় উদয় হয় দ্বিতীয় বিরহ দিন। তারপর কেটে যায় আরো দিন, মাস বছর। তারপর বছরের পর বছর শুষ্ক আঁখিজলে।

ফিরতি পথে যাত্রা কুমিল্লায়

আবার যাত্রা বিরতি কুমিল্লায়। পথশ্রান্ত কবি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন পথে। সঙ্গী বীরেন্দ্রের সহায়তায় এসে উঠেছিলেন কান্দিরপাড়ার শ্রীমতি বিরজা সুন্দরী দেবীর আশ্রয়ে। এখানে রোগশয্যা থেকে বন্ধু ও মামা শ্বশুর আলী আকবার খানকে আশ্বস্ত করে পত্র পাঠালেন দৌলতপুরে। এখানে পত্রটি হুবহু তুলে ধরা হলো–

www.nagorikpathagar.org

বাবা/শ্বশুর,

আপনাদের এ অসুর জামাই পশুর মতো ব্যবহার করে এসে যা কিছু কসুর করেছে, তা ক্ষমা করো সকলে। অবশ্য যদি ক্ষমা চাওয়ার অধিকার থাকে। এইটুকু মনে রাখবেন আমার দেবতা নেহায়েত অসহ্য না হয়ে পড়লে, আমি কখনো কাউকে ব্যথা দেই না। যদিও ঘা খেয়ে খেয়ে আমার হৃদয়টাতে ঘাঁটা বুঁজে গেছে। তবুও সেটার অন্তরতম প্রদেশটা এখনো শিরীষ ফুলের পরাগের মতোই কোমল আছে। সেখানে খোঁচা লাগলে আর আমি থাকতে পারি না। তাছাড়া আমিও আপনাদের পাঁচজনের মতো মানুষ। আমার গণ্ডারের চামড়া নয়। কেবল সহ্যগুণটা কিছু বেশি। আমার মান অভিমান সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। বা কেয়ার করিনি বলে আমি কখনো এতবড় অপমান সহ্য করিনি। যাতে আমার ম্যানিশনেস বা পৌরষ্যে গিয়ে বাজে। যাতে আমাকে কেউ কাপুরুষহীন ভাবতে পারে। আমি সাধ করে পথের ভিখারী সেজেছি বলে লোকের পদাঘাত সইবার মতন ক্ষুদ্র আত্মা অমানুষ হয়ে যাইনি। আপনজনের কাছ থেকে পাওয়া অপ্রত্যাশিত এত হীন ঘৃণা অবহেলা আমার বুক ভেঙ্গে দিয়েছে।

বাবা আমি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। দোয়া করবেন আমার এ ভুল দু'দিনেই ভেঙ্গে যায়। বাকি উৎসবের জন্য যত শিগগির পারি বন্দোবস্ত করবো। বাড়ির সকলকে দস্তর মতো ছালাম ও দোয়া জানাবেন। অন্যান্য যাদের কথা রাখতে পারিনি তাদের ক্ষমা করতে বলবেন। তাকেও ক্ষমা করতে বলবেন- যদি এ ক্ষমা চাওয়ার ধৃষ্টতা না হয়।

আরজ ইতি
চির সত্য স্নিহাসিক্ত
নুরু

উপরোক্ত পত্রের ছত্রে ছত্রে কবির ক্ষোভ ও মান অভিমান প্রকাশ পেয়েছে। কিছু শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে দৌলতপুরে কবির আত্মমর্যাদা, আত্মঅহম ও পৌরষ্যের প্রতি নিদারুণ আঘাত করা হয়েছিল বলে মনে হয়। সে জন্যই কবি তাৎক্ষণিকভাবে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও বিবাহের বাকি অনুষ্ঠান ও উৎসব যথাশীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করা হবে বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন।

১৮ই জুন হতে ৮ই জুলাই কবি কুমিল্লায় গুপ্ত পরিবারের আশ্রয়ে ছিলেন। তখন খাঁ পরিবারের একান্ত দোরগোড়ায় রোগশয্যায় পড়ে থাকা তাদের নতুন জামাইয়ের প্রতি খাঁ পরিবারের কোনো সৌজন্য ও সহমর্মিতা লক্ষ্য করা যায়নি। বিষয়টি বিস্ময়কর বৈকি।

www.nagorikpathagar.org

পত্রটি কবির নয়। আলী আকবার খান স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থে কবির নামে জালিয়াতি করেছেন বলে কবি বন্ধু কমরেড মোজাফ্‌ফর আহ্‌মদ মন্তব্য করেছেন। অপরদিকে কবির আর এক অনুরক্ত 'যুগস্রষ্টা নজরুল' গ্রন্থের প্রণেতা খান মো. মইন উদ্দীন পত্রটি কবির বলেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। যদিও অসুর, কসুর ও পশুর শব্দগুলো কিছু বিভ্রাট ঘটায়; তা সত্ত্বেও পত্রটি কবির বলেই তার দৃঢ়বিশ্বাস। পত্রের মর্মে, মর্মে কবির যে ক্ষোভ ও মান অভিমানের ঘটনার ছায়া নিক্ষেপিত হয়েছে, তাতে পত্রটি কবির বলেই কমরেড মোজাফ্‌ফর ছাড়া সম-সাময়িক প্রায় সকলেই একমত ছিলেন।

কবির বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র কবির বন্ধু সুহৃদদের বরাবর পাঠানো হয়েছিল। কমরেড মোজাফ্‌ফর আহমদও পেয়েছিলেন সে পত্র। নিমন্ত্রণপত্রটি পড়ে কমরেড বিস্মিত ও ক্ষিপ্ত হন। তিনি তার ক্ষিপ্ত হওয়ার কারু জানিয়ে ২৬শে জুন তারিখে গোপনে কবিকে একটি পত্র দেন। হিসাব মতে কবি তখন ফিরতি পথে কুমিল্লায়। পত্রটি নিম্নে দেয়া হলো–

কাজী সাহেব,
আপনার পত্রাদি যে আর মোটেই পাওয়া যাইতেছে না। তার কারণ কি? খান সাহেবের নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছিলাম। পত্রটি আপনারই মুসাবিদা করা দেখলাম। পত্রের ভাষা দু'এক জায়গায় বড় অসংযত হয়েছে। একটু যেন কেমন দাম্ভিকতা প্রকাশ পেয়েছে। আপনার হাত দিয়ে অমন লেখা বের হওয়া কিছুতেই ঠিক হয় নাই। আমার বড় ভয় হইতেছে যে খান সাহেবদের সংস্রবে থাকিয়া আপনি না শেষে দাম্ভিক হয়ে পড়েন। অন্যে বড় বলিলে গৌরবের কথা হয়। নিজেকে নিজে বড় বলিলে অগৌরবের মাত্রা বাড়িয়া যায়। মোহাম্মদীতে বিবাহের কথা ছাপিতে অনুরোধ করাটা ঠিক হয়েছি কি? তারা তো নিজে থেকে ছাপিতে পারিতেন। বাস্তবিক আমার প্রাণে বড় বাজিয়াছে বলিয়াই এত কথা বলিলাম। নিমন্ত্রণপত্রটি আবার অপূর্ব নিমন্ত্রণপত্র শিরোনামে বাঙ্গালিতে মুদ্রিত হয়েছে দেখলাম। বাঙ্গালিতে এ নিমন্ত্রণপত্রটি কে পাঠাইয়াছিল? আপনার অঙ্কলক্ষ্মীকে এই অপরিচিতের বিনয় সম্ভাষণ জানাইবেন।

১৮ই জুন ১৯২১ হতে ৮ই জুলাই ১৯২১ সাল পর্যন্ত কবি কুমিল্লায় বিরজা সুন্দরী দেবীর আশ্রয়ে ছিলেন। এ সময় কবি নিদারুণ অর্থ সঙ্কটে ছিলেন। অনন্যোপায় কবি বন্ধু কমরেড মোজাফ্‌ফরের শরণাপন্ন হন। কমরেড কবির অর্থের সংস্থান করেন এবং নিজে কুমিল্লায় আসেন। তিনি গুপ্ত পরিবারের সহিত গোপন বৈঠক করেন এবং কবিকে নিয়ে কলকাতায় আসেন। আসার আগে কমরেড একটু তলিয়ে দেখলেন না কবি কোথায় কি

www.nagorikpathagar.org

অপকর্ম করে ফেলেছেন। প্রতীয়মান হয় যে আলী আকবার খানের সহিত পূর্ব বিদ্বেষ বশত কমরেড এ বিষয়ে তলিয়ে দেখার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। কমরেডের ষড়যন্ত্রের প্রথম প্রকাশ ঘটে এখানেই। কমরেড ও আলী আকবার খানের মধ্যে চলতে থাকা বিরোধ, বিদ্বেষ ও কমরেডের প্রতিহিংসা চরিতার্থের লিপ্সাই নজরুল নার্গিসের বিয়োগ বিধুর ট্র্যাজেডি সৃষ্টির মূল কারণ।

আলী আকবার খান স্বাক্ষরিত কবির বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রটি নিয়ে কলকাতায় নানা হাস্য রসিকতার সৃষ্টি হয়েছিল। নিমন্ত্রণপত্রটির বাড়াবাড়ি বিশেষ করে মুসলিম বাংলার রবি কবি আয়মাদার ইত্যাদি দেখে সকলে আহত হয়েছিলেন। বেশি আহত হয়েছিলেন 'অপূর্ব নিমন্ত্রণপত্র' শিরোনামে ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরসের কারণে। কবি অবশ্য পত্রের মুসাবিদা তার নয় বলে পরবর্তীতে তার 'কবি বরের প্রতিবাদ' শীর্ষক প্রতিবাদ লিপিতে দাবি করেছেন।

কবি কুমিল্লায় থাকাকালে বিরজা সুন্দরী দেবীর সাহিত্য রস উথলে উঠেছিল। তিনি 'নৌকা ভ্রমণ' শিরোনামে একটি রচনা লেখেন। তার সাহিত্য সাধনার এটি প্রথম ফসল, এটিই শেষ। এটি মূলত দৌলতপুর ও খাঁ পরিবারকে হেয় প্রতিপন্ন করার নিমিত্তে ফরমাইশী রচনা।

কমরেড মোজাফ্ফর আহমদ ছিলেন কমিউনিস্ট রাজনীতিবিদ। অপরপক্ষে আলী আকবার খান ছিলেন ইসলামী চিন্তা-চেতনার ধারক ও ব্যবসায়ী। কমরেড মোজাফ্ফর চাইতেন কবি কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন হোক। তিনি কবিকে বেশি করে খাটিয়ে নিতেন এবং কবির প্রতি অভিভাবকসুলভ আচরণ করতেন। আলী আকবার খান বিশ্বাস করতেন রাজনীতিবিদ অনেক জন্মায় কিন্তু কবি জন্মায় ক'জন। তাই তিনি কমরেড মোজাফ্ফরের খপ্পর হতে কবিকে মুক্ত করতে চাইতেন। স্বাধীনভাবে মুক্ত চিন্তায় ও ইসলামী ধ্যান-ধারণায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে চান। মূলত বিরোধ এখানে।

কবি যখন আলী আকবার খানের সাথে কুমিল্লায় যাওয়ার ইচ্ছা করেন কমরেড মোজাফ্ফর তখন নানা কল্পিত ভয়ভীতির অবতারণা করে কবিকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। তা সত্ত্বেও কবি আলী আকবার খানের সহিত কুমিল্লায় চলে যান। তিনি এ জন্য আলী আকবার খানকে দায়ী করেন এবং মনে মনে আলী আকবার খানকে দেখে নেয়ার ইচ্ছা পোষণ করতে থাকেন।

কবির বিয়ের খবরে কমরেড মোজাফ্ফর আহমদ বিচলিত হয়ে পড়েন। কবির বিয়ের ব্যাপারে তিনি দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করেন। একদিকে তিনি ভালোয় ভালোয় শুভ বিবাহ সম্পন্ন হোক, অন্যদিকে কবির বিয়ে পণ্ড করার সংকল্প করেন। চিরদিনের জন্য কবি আলী আকবার খানের বলয়ে যাবেন আশঙ্কায়

www.nagorikpathagar.org

কমরেড মোজাফ্‌ফর আহমদ এ দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করেন। তিনি তার রাজনৈতিক ভাবশিষ্য কুমিল্লার সেন পরিবারকে কবির বিয়ে পণ্ড করার কাজে লাগান।

সেনরা নানা প্রকার অপকৌশল করেও কবির বিয়ে পণ্ড করতে না পারলেও কৌশলে কবিকে দৌলতপুর ত্যাগে বাধ্য করেন। এটা এ মিশনের প্রাথমিক সাফল্য ভেবে কমরেড মোজাফ্‌ফর আহমদ খুশি হন এবং কুমিল্লায় ছুটে আসেন। তিনি কবিকে নিয়ে সেন পরিবারের সহিত রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। এ বৈঠকে তিনি কবির নিকট হতে চিরদিনের জন্য দৌলতপুরের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ও পরবর্তীতে তার পরামর্শ পরিকল্পনা মতো চলার অঙ্গীকার আদায় করতে সক্ষম হন। তিনি চিলের মতো ছোঁ মেরে কবিকে নিয়ে কলকাতায় চলে যান। সে হিসাবে কুমিল্লার সেনবাড়ি কবির বিয়ে বিষয়ক ষড়যন্ত্রের সুতিকাগার বলা চলে। এ সুতিকাগারে কমরেড মোজাফ্‌ফর আহমদ কবির উপর প্রভুত্ব ও অভিভাবকত্ব পাকাপোক্ত করে নেন।

কবি বরের প্রতিবাদ

প্রথমেই বলে রাখি, আমার এ কবি বরের অর্থ কবি শ্রেষ্ঠ নয়। এ কবি বরের মানে যে কবি বিয়ের বর। কারণ দিন কতক আগে আমি বাস্তবিক অন্তত ঘণ্টা কয়েকের জন্য বর সেজেছিলুম। যদিও বরের এখনো বধূর সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই। যাক সে কথা, আমার ওই ত্রিশঙ্কু বিয়েতে শ্বশুরকুলের কর্তৃপক্ষগণ এক কাব্যিক নিমন্ত্রণপত্র ছাপিয়েছিলেন এবং সেটি চরমে গিয়ে পৌঁছেছে এই জন্য যে, সেটা আবার আমার সাহিত্যিক ও কবি বন্ধুবর্গের নিকট পাঠানো হয়েছে। সেটা এক প্রকার জামাই বিজ্ঞাপন বললেও হয়। ওতে আমার নামের আগে ও পেছনে এত লেজুড় লাগিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কোনো চতুষ্পদ জীবেরই এতগুলো লেজ থাকে না। অবশ্য ওটা কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রণপত্র। অতএব আমার ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার ছিল না। কিন্তু মজা হয়েছে যে, আমার অধিকাংশ বন্ধু ওটা নিয়ে এই ভেবে ক্ষুব্ধ হয়েছেন যে, আমি আমার নামে এই সব অভিধান উজাড় করা বিশেষণ লাগানো ও প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দিয়েছি। তাই আমি জানাচ্ছি যে, চোখে দেখাটাই বেশি প্রমাণ। অন্যের প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটা আমার সত্যিকার পরিচয় নয়। এতদিনের চেনা শোনার পরেও যারা গোটা কয়েক কালির আখরের ঢাকনায় ঢেকে দিতে চায়, তাদের আমার বলবার কইবার নেই। আমি পথের ভিখারী, আমার পথিক জীবনের শেষও ঘনিয়ে এসেছে। রবির সহিত এ খদ্যোত কবির তুলনায় আমি গভীরভাবে প্রতিবাদ করছি। সৈনিক কবি হয়ত হতে পারি, কারণ আমি দিন কতক ছন্দ নিয়ে

www.nagorikpathagar.org

সৈনিকের মতনই কুস্তাকুস্তি করেছি। আর কথাকে পাট করে সাজাই বলে কবি। যেমন- কাপড় ধোলাই পাট করতে পারলেই ধোবী হওয়া যায়। ক্ষমা চাইলুম না, আমি কোনো দোষ করিনি। যাক আর শিয়ালের ও নিয়ে পর্ব্বত করবো না।

ইতি
কাজী নজরুল ইসলাম
কুমিল্লা

কবি বরের প্রতিবাদ একটি ফরমায়েশী প্রতিবাদ। এটি ষড়যন্ত্রকারী পক্ষের চাহিদাপত্র। বিরজা সুন্দরী দেবীর নৌকা ভ্রমণ, কবি বরের প্রতিবাদ ও কবির বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র কবিরই মুসাবিদা করা, অথবা এগুলোর মুসাবিদায় কবির প্রত্যক্ষ হাত ছিল বলে সমসাময়িক প্রায় সকলে একমত পোষণ করেন। স্থান ও তারিখ নিয়ে বিভ্রাট ঘটিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। নৌকা ভ্রমণ ও কবি বরের প্রতিবাদে ত্রিশঙ্কু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ত্রিশঙ্কু মানে তিনটি শঙ্কাকুল অবস্থা বোঝায়। কি সেই তিনটি অবস্থা, বোধগম্য নয়। কবি বরের প্রতিবাদ একটি মিথ্যাশ্রয়ী প্রতিবাদ। সত্য ও সুন্দরের পূজারী কবি এখানে নির্মমভাবে সত্য ও সুন্দরকে উপেক্ষা করেছেন। তার কনসাসের অহমিকা দারুণভাবে পদদলিত হয়েছে। এতে সন্দেহ কি?

ভূতে পেলে মানুষের মনুষ্য সত্তা নাকি ভূতের অধীন হয়ে যায়। তখন কথনে, বলনে, চাল-চলনে ভূতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কবি ক'দিন আগে মামা শ্বশুর আলী আকবার খানকে লেখা পত্রে ক্ষোভ, মান অভিমান প্রকাশের পাশাপাশি দন্তর মতো সকলের নিকট ক্ষমা চেয়ে নিলেন। এমনকি নববধূ নার্গিসের নিকট ও পরোক্ষভাবে ক্ষমা চেয়ে বিয়ের বাঁকি অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি যথাশীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। সেই কবি ক'দিন পর কমরেড মোজাফ্ফর আহমদের ষড়যন্ত্রের বিষটোপ পুরে কলের পুতুলের ন্যায় কমরেডের ইচ্ছা অনিচ্ছার কাছে নিজেকে সোপর্দ করলেন। কবি বরের প্রতিবাদপত্রে দৌলতপুরের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। ভূতের আছর কেটে গেলে মানুষ স্বাভাবিক হয় কিন্তু কবির উপর কমরেডের আছর আর কোনোদিন কেটে যায় নাই। যার ফলে দৌলতপুরের সকল স্মৃতির সমাধি হয়ে গেল। মাতৃময়ী এখতারুন নেসার মাতৃরূপ অপমানিত হয়ে গেল। কবি ও নার্গিসের প্রেম, প্রণয় আর পরিণয় দুঃস্বপ্নে পর্যবসিত হয়ে গেল, যা কখনো বাঞ্ছিত ছিল না অন্তত একজন কবির নিকট হতে।

ঘণ্টা কয়েকের জন্য বর সেজেছিলুম। যদিও বরের এখনো বধূর সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই।

www.nagorikpathagar.org

কবি বরের প্রতিবাদে এ কথাটি উল্লেখ করে কবি নির্ভেজাল সত্যকে গোপন করে উৎরে যাবার প্রয়াস পেয়েছেন। দৌলতপুরের এ বালিকার সহিত কবির প্রেম প্রণয় ও পরিণয় হঠাৎ কোনো ফসল ছিল না। দীর্ঘ আড়াই মাস তিলে তিলে গড়ে ওঠা প্রেম ও প্রণয় কবির সম্মতিতে পরিণয়ে রূপ লাভ করেছিল, যা কবির বন্ধু সুহৃদদের কাছে ব্যক্তিগতপত্রে কবি নিজেই উল্লেখ করেছিলেন। কবির এ প্রেম ও পরিণতির স্বীকৃতি ও সমন্বয় দিয়েছিলেন মাতৃময়ী এখতারুন নেসা। এমনকি বিয়ের দিন তারিখ ও দেনমোহর নির্ধারণ, বিয়ের পর কবি নববধূ নিয়ে কোথায় বসবাস করবেন ইত্যাদি বিষয়ে কবির সহিত আলোচনাসাপেক্ষে ও সম্মতিতে স্থির করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ঘণ্টা কয়েকের জন্য বর সাজা কেন? এটা কি সত্যকে অস্বীকার করা নয়? অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া বোঝায় না? কমরেডের বিষ টোপে বুঁদ হয়ে কবি সত্যকে অস্বীকার করেছেন বৈকি।

কমিউনিজম বনাম ইসলামিজম

কবিকে চিলের মতো ছোঁ মেরে কলকাতায় নিয়ে কমরেড মোজাফফর চুপ থাকেন নাই। তিনি তার চাতুরতাপূর্ণ ষড়যন্ত্র আড়াল করতে কবির বন্ধু হিতৈষী মহলে নানা অপপ্রচারে লিপ্ত হন। তিনি আলী আকবার খান, কবিবধূ নার্গিস, তার আত্মীয়দের বিরুদ্ধে নানা কল্পিত অপবাদ, রটনা ও অপপ্রচারে লিপ্ত হন। তার প্রচারণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে, কবি আলী আকবার খান কর্তক দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জনায় নিপতিত হতে যাচ্ছিলেন। তিনি নেহায়েত উদ্ধার না করলে কবির সমূহ সর্বনাশ ঘটে যেত।

তরুণ কবি নজরুলের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে কবির উপর দুইটি ধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ধারা দুটি নিম্নরূপ–

কমিউনিজম

কমরেড মোজাফ্ফর ছিলেন কট্টর কমিউনিস্ট ও মার্কসবাদে তার অবিচল আস্থা ছিল। তার নবযুগ পত্রিকাটি ছিল কমিউনিস্ট রাজনীতির মুখপাত্র। নবযুগে কাজ করতেন কবি। কমরেড তার পত্রিকায় মাত্রাতিরিক্ত খাটিয়ে নিতেন। কবির উপর কমরেড অভিভাবকসুলভ ও প্রভুত্বমূলক আচরণ করতেন। দেখেশুনে মনে হতো কবি নিতান্ত নাবালক ও বিষয়বুদ্ধিতে অপরিপক্ব।

কমরেড মোজাফ্ফর চাইতেন কবি কমিউনিজমে দীক্ষা গ্রহণ করুক। মার্কসবাদের জয়গান করুক। কমিউনিস্ট রাজনীতিতে পুরোপুরী যুক্ত হোক। কমরেড যতই টানুক কিন্তু কবি তাতে সাড়া দেন নাই। কমিউনিজমের আদর্শে লেখনী চালিয়েছেন বটে কিন্তু কমিউনিস্ট হন নাই ও মার্কসবাদে দীক্ষাও নেন

www.nagorikpathagar.org

নাই। এ জন্য কমরেড মোজাফ্ফরের খেদের অন্ত ছিল না। তার সে খেদের প্রকাশ পেয়েছে তারই লেখা নজরুল স্মৃতিকথায়– সে যে আমার সঙ্গে কমিউনিস্ট রাজনীতিতে টিকে রইলো না। সে যে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করলো। তার জন্য আমার খেদের অন্ত ছিল না। তাই তিনি কমিউনিজমের কুইনাইন গিলাবার জন্য অন্যদের প্রভাব মুক্ত রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। কারো সহিত কবির মেলামেশা পছন্দ করতেন না।

ইসলামিজম

অপরদিকে আলী আকবার খান, আফজালুল হক, ওয়াজেদ আলী প্রমুখ কবি বন্ধু হিতৈষীগণ ছিলেন ইসলামী চিন্তা-চেতনার ধারক। তারা চাইতেন কবি কমরেড মোজাফ্ফরের খপ্পর মুক্ত হোক। কমরেডের দেয়া মাত্রাতিরিক্ত খাটুনি থেকে স্বাধীন হোক। মুক্তিবুদ্ধির চর্চা করুক। ইসলামী আদর্শে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হোক। এ জন্য তারা এক সময় কবিকে মুক্ত করে দেওঘরে পাঠিয়েছিলেন।

আধ্যাত্মিক ধারার কবি বন্ধু ও সুহৃদগণ চাইতেন না কবি কোনো রাজনৈতিক দলের বিশেষ করে কমিউনিস্ট দলের মুখপাত্র হোক। তারা মনে করতেন, রাজনীতিবিদ অনেক আছে, অনেক জন্মায়। কিন্তু নজরুলের মতো প্রতিভা শুধু দেশে নয়, সবদেশেই বিরল। তাই কমরেড মোজাফ্ফর না চাইলেও তারা সাধ্যমতো কবির পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ যুগিয়ে যেতেন।

কবি কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের আগে ও পরে কলকাতার কবি বন্ধু হিতৈষী মহলে নানা প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। কবির দৌলতপুরে দীর্ঘ স্বেচ্ছা নির্বাসন, কবির ঘনিষ্ঠ বন্ধু মহলে বিয়ের সংবাদ জানিয়ে ব্যক্তিগতপত্র, কবির বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র, অপূর্ব নিমন্ত্রণপত্র শিরোনাম, শ্রীমতি বিরজা সুন্দরী দেবীর নৌকা ভ্রমণ, কবি বরের প্রতিবাদ ও মোজাফ্ফর আহমদের একতরফা প্রচারণা মিলিয়ে টক মিষ্টি ঝাল গোছের মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে আলী আকবার খান সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও কমরেড মোজাফফর সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা প্রায় সবার মনে বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল। এ ধারণার ঊর্ধ্বে উঠে কেউ উঁকি দিয়ে দেখেন নাই প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছিল দৌলতপুরে। যদি দেখতো তবে কমরেড মোজাফ্ফরের চাতুরতা ধরা পড়ে যেত এবং দৌলতপুরের ঘটনা ট্র্যাজেডি রূপ নিত না। কবির বিয়ের সময় রেল শ্রমিক ধর্মঘট না থাকলে বন্ধু সুহৃদদের উপস্থিতিতে কমরেড মোজাফ্ফর আহমদের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারের এমন সুযোগ হতো না বলে পরবর্তীতে অনেকে মনে করেন।

কমরেড মোজাফ্ফরের অনেক কথাই সে সময় অনেকে মেনে নেয় নাই। এদের মধ্যে ছিলেন কবি আব্দুল কাদির, খান মোঃ মইন উদ্দীন, মাহফুল্লাহ প্রমুখ।

www.nagorikpathagar.org

কী ঘটেছিল দৌলতপুরে

আলী আকবার খানের সহিত তার গ্রামের বাড়ি দৌলতপুরে যাবার মতামত চাইতে গেলে কমরেড মোজাফ্ফর আহমদ তো অনুমতি দিলেনই না বরং উল্টো কবিকে আলী আকবার খান সম্পর্কে নানা মিথ্যাচার করে কল্পিত বিপদাপদের পূর্বাভাস দিয়ে না যাবার জন্য সতর্ক করেন তা সত্ত্বেও কবি আলী আকবার খানের সহিত তার গ্রামের বাড়ি দৌলতপুরে চলে যান। এতে কমরেড মোজাফ্ফর আহমদ ক্ষুব্ধ ও অপমানিত হন। এজন্য আলী আকবার খানকে দায়ী করেন এবং তাকে দেখে নেয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকেন।

কবি এলেন দৌলতপুর। থাকলেন প্রায় আড়াই মাস। এক নাগাড়ে আড়াই মাস কবির দৌলতপুরে অবস্থান মহা বিস্ময়ের ব্যাপার। কলকাতার কোলাহলে কবি অভ্যস্ত। তার জন্য এটা অকল্পনীয় বটে!

দৌলতপুরের অপূর্ব পল্লী পরিবেশ কবিকে মুগ্ধ করে রাখলো। বিমোহিত হলেন কবি দৌলতপুরবাসীদের আতিথেয়তায়। গ্রামবাংলার মুক্ত পরিবেশে একান্ত মুক্তভাবে কবি সাহিত্য সৃষ্টি করতে লাগলেন। হাসিখুশিতে মেতে ও মাতিয়ে তুললেন কবি সবাইকে। খাঁ বাড়ির একজন হয়ে গেলেন কবি। মুক্ত বিহঙ্গের মতো মুক্ত সঙ্গীতে বিভোর কবি এখানে।

খাঁদের বোন এখতারুন নেসা খাঁ বাড়ির সর্বময়ী কর্ত্রী। তিনি কবিকে দেখাশোনা করতেন। কবি মমতাময়ী এ মহিলাকে মা বলে ডাকতেন। তার কাছেই নানা অনুযোগ আবদার করতেন। নানা দুরন্তপনা ও মাতামাতিতে এ সন্তানহীনা মহিলার সন্তান বুভূক্ষা নিবৃত্ত করতেন।

খাঁ বাড়ির এক বিবাহ উৎসবে কবির দেখা খাঁদের অনিন্দ সুন্দরী বিদুসী ভাগিনেয়ী সৈয়দা খানম যুধীর। প্রথম দেখায় প্রেম। কবি সৈয়দার নতুন নাম দেন নার্গিস খানম। কবি ও নার্গিসের প্রেম গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। এক সময় উভয়ে পরস্পরকে মন দিয়ে ফেলেন। মাতৃময়ী এখতারুন নেসার নজর এড়ায় না বিষয়টি।

প্রেমবিদ্ধা এ কপোত ও কপোতী যুগল সময় সুযোগমতো মমতাময়ীকে তাদের মনের কথা নিবেদন করেন এবং পরস্পরকে পাওয়ার আবেদন করেন। সংসার জীবনে এ প্রেমিক-প্রেমিকার কথায় তার মাতৃহৃদয় গলে গিয়েছিল। তিনি এদের বিয়ের কথা ভাবলেন। কিন্তু তিনি ভাবলেই তো হবে না। কোমলমতি এ প্রেমিক যুগলকে পরিণয়ে বেঁধে দিতে তিনি নানা পথ খুঁজতে লাগলেন।

বোন এখতারুন নেসা ছোট ভাই আলী আকবার খানকে একান্তে ডেকে নিলেন। দু'ভাইবোনের মধ্যে যে কথোপকথন হলো তা নিম্নে দেয়া হলো–

বোন : তোকে একটা কাজ করতে হবে। আগে ওয়াদা কর, তবে কাজের কথা বলবো।

www.nagorikpathagar.org

ভাই : (দ্বিধাহীন চিত্তে) ওয়াদা ওয়াদা ওয়াদা।

বোন : নজরুল নার্গিসের বিয়ে দিতে হবে। আর এ কাজটা তোকেই করতে হবে।

ভাই : (চিন্তিত হয়ে) নজরুলের আর্থিক দিকটা আমার জানা। আর জানা নার্গিসের দিকটাও। কিন্তু...

বোন : (দৃঢ় কণ্ঠে) কোনো কিন্তু নয়। যেভাবে হোক এটা তোকে করতে হবে।

ভাই : (চিন্তাযুক্ত কণ্ঠে) তা না হয় করলাম। ওরা ঘর বাঁধবে কি করে? ওদের যে সঙ্গতি নেই।

বোন : সে চিন্তা তোকে করতে হবে না। সে ব্যাপারেও আমি ভেবে রেখেছি। আমরা তিন বোন পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ পাব। তা নজরুল নার্গিসের জন্য ছেড়ে দিব।

ভাই : (সোৎসাহে) হ্যাঁ, তাহলে হতে পারে। ওতে ঢাকা কিংবা কলকাতায় ওদের বাড়ি হতে পারে। এ হিসেবে এটা করা যায়।

বোন : করা যায় নয়, করতেই হবে।

ভাই : বড় ভাই ও অন্যান্যদের রাজি করার দায়িত্ব কিন্তু তোর আপা?

বোন : সে ভার আমার উপর ছেড়ে দে, তুই এখন হতে কাজে লেগে যা।

ভাই : (চপলতায়) এ যে মহারানীর আদেশ! অমান্য করার উপায় আছে? যাই তবে কাজে লেগে পড়ি...। আলী আকবার খান চলে যান।

এখতারুন নেসার উৎসাহে এবং প্রস্তাবে বিয়ের এ প্রস্তাব সর্ব সম্মতি লাভ করেছিল। শুনে খুশি হয়েছিলেন কবি। নার্গিসও। কথা হয়েছিল ঢাকা ও কলকাতায় বাড়ি না হওয়া পর্যন্ত নার্গিস দৌলতপুরেই থাকবে। প্রয়োজনবোধে কবি বউকে নিজবাড়ি বা কলকাতায় নিতে পারবেন।

বিয়ে পাকাপাকি হয়েছিল জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষী। পরে পরিবর্তিত হয়ে ৩রা আষাঢ়। এসব কিছু স্থির হয়েছিল কবির সম্মতিক্রমে। চালচুলোহীন কবিকে সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য খাঁদের এহন আত্মত্যাগ কবির ভাগ্যে সইলো না। মধ্য সাগরে নৌকা ডুবার কথা স্মরণ করে দেয়া পাগলের মতো কবি ষড়যন্ত্রের পুতুল হয়ে সৈকতে পৌছার আগে ডুবে দিয়েছিলেন তার সওদাভরা সপ্ততরী। না চাইতে যা পাওয়া যায়- তা অনেকের সয়না, সইলো না কবিরও।

ষড়যন্ত্রের নীলদংশন

কমরেড মোজাফ্ফর আহমদ কর্তক প্রলুব্ধ হয়ে আলী আকবার খান কর্তক নিমন্ত্রিত সেনরা বিরাট বহরের প্রস্তুতি নিলেন দৌলতপুরে বিয়ে বাড়ি যাবার জন্য। নির্দিষ্ট দিনে আলী আকবার খানের বড়ভাই আলতাফ আলী

www.nagorikpathagar.org

খান এসেছিলেন সম্মানিত সেন পরিবারকে স্ব-সম্মানে দৌলতপুর নিয়ে যেতে। সেনরা বিয়ের আগের দিন পৌঁছেছিলেন বিকালে। নাতনীর বিয়েতে এলেন নানীরা। দেখা যাক, বিয়ে বাড়িতে আনন্দ হিল্লোলে কী মাত্রা যোগ হয়?

দৌলতপুরে পা দিয়েই সেন পরিবার যা শুরু করে দিলেন তাতে বিয়ে বাড়ির আনন্দ এক নিমিষে উবে গিয়েছিল। নেমে এসেছিল বিষাদিত কালো ছায়া। সেনদের নগ্ন ও নির্লজ্জ ভূমিকায় মুহূর্তে বিয়েবাড়িতে নেমে আসে থমথমে অনিশ্চয়তার ভাব। নাক সিটকিয়ে তারা দৌলতপুর খাঁ বাড়ির পরিবার-পরিজন এমনকি আমন্ত্রিত ও আগত অতিথিদের নির্লজ্জ মন্তব্য ছুঁড়ে মারতে থাকলেন। ভাবটা যেন এ রকম যে, নিতান্ত নোংরা ও ঘৃণিত পরিবেশে এসে পড়ে সম্ভ্রান্ত দেবীদের জাত যাবার উপক্রম হয়েছিল।

প্রত্যক্ষদর্শী অ্যাডভোকেট সুলতান মাহমুদ মজুমদার তার 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি' গ্রন্থে দেবীদের আচরণ তুলে ধরেছেন এভাবে–

বিরজা সুন্দরী দেবী খাঁ বাড়িতে পা দিয়েই একরাশ তীক্ষ্ম মন্তব্য ছুঁড়ে মারলেন– ওমা এ যে একেবারে অজপাড়া গাঁ। বৃষ্টি হলেই মাটি গলে গিয়ে কাদা হয়ে যায়। মাটিতে পা দিতে গা ঘিনঘিন করে। এ বাড়িতে লেখাপড়া নাই। আলী আকবার খানের মেজভাই (ওয়ারেছ আলী খান) ক্ষেতখামার নিয়ে থাকে। একেবারে বদ্ধ চাষার বাড়ি। মেয়েরা ভালো কাপড় পরতে জানে না। চুল বাঁধতে পারে না। পাত্রীর মাত্র অক্ষরজ্ঞান আছে- ইত্যাদি।

বিয়েবাড়ির সর্বত্র তারা খুঁত ধরতে শুরু করে দিলেন। কূট-কটাক্ষে জর্জরিত করতে লাগলেন সবাইকে। আমন্ত্রিত আগত অতিথিরাও বাদ গেল না তাদের নাক সিটকানি থেকে। তারপর দেবীরা মুখ্য কাজে হাত দিলেন। কবিকে একান্তে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, এ যে নিতান্ত অজপাড়া গাঁ। তাতে পাত্রীর অক্ষরজ্ঞান মাত্র। এ নোংরা পরিবেশে বিয়ে না করাই ভালো। গিরিবালা আরো একধাপ এগিয়ে বলেছিলেন, তোমার মতো ছেলে নার্গিসের মতো মেয়েকে বিয়ে করবে কেন? সে তোমার ঘর করার যোগ্য? তুমি চাইলে কোন ভালো পরিবারে বিয়ে করতে পারবে না? কে তোমাকে মেয়ে দিতে অমত করবে? প্রমাণ চাও তো বলো আমরাই তোমাকে শহরের ভালো ঘরে, নার্গিসের চেয়ে ভালো মেয়ের সাথে তোমার বিয়ে দিচ্ছি।

কাবিননামা ও ঘরজামাই প্রশ্নে দেবীরা কবিকে উসকিয়ে দিয়ে বললেন, দেখ- আলী আকবার লোকটা সুবিধার নয়। তার কু-মতলব আছে। সে তোমাকে আটকাতে চায়। কিনে নিতে চায়। তাই তোমাকে ঘরজামাই করে রাখবার জন্য ফন্দি এঁটেছে। ওই ধিঙ্গি মেয়ের বর পাচ্ছে না তো তাই।

www.nagorikpathagar.org

ঘরজামাই কোন বেটা ছেলে থাকে? তোমার মতো ছেলে ঘরজামাই থাকবে কেন? কি নাই তোমার? আলী আকবার চিরদিনের মতো তোমাকে কিনে রাখবার জন্য ওই কাবিনে সই করিয়ে নিয়েছে। অত টাকা মোহর করেছে। এ সোজা কথাটা বোঝ না? এ বিয়ে না করে সোজা কুমিল্লায় যাও। বিয়ে ভেঙ্গে দাও।

সরলমতি কবি এই কান কথায় একেবারে গলে গিয়েছিলেন। কুহকিনী দেবীদের কুহকের ফাঁদে পড়ে কাবিনের শর্ত নিয়ে আলী আকবার খানের সহিত বিষম বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে বিয়ে পণ্ড হওয়ার উপক্রম হয়। একপর্যায়ে বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে কুমিল্লায় চলে যাওয়ার উদ্যোগ নেন। সারা বিয়েবাড়িতে এসেছিল হতাশা আর অনিশ্চয়তার থমথমে ভাব। কুমিল্লার দেবীরা ও তাদের সহযোগীরা কবিকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে একপায়ে তৈরি ছিলেন।

সূত্র :

প্রথম প্রিয়া ও নার্গিস বেগম– অধ্যাপক মিলন দত্ত।

কাজীদার স্মৃতি– উৎফতের নেসা বিদ্যা বিনোদিনী।

কুমিল্লার দেবীদের চেয়েও সম্ভ্রান্ত ও বিদুষী দেবদেবী কবির বিয়ে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। এখন দেখা যাক, তারা কে কি বলেন–

(এক) বাঙ্গুরার জমিদার রায় সাহেব রূপেন্দ্র লোচন মজুমদার রায় বাহাদুরের বিদুষী স্ত্রী শ্রীযুক্তা কিরন বালা দেবী এক পত্রে জানিয়েছেন, বিরজা সুন্দরীর মতো অমন অমানুষ আমি আর দেখি নাই। ওরাই গোটা আয়োজনটাকে পণ্ড করে দিতে তৎপর হয়। বেড়াতে এসে অতিথিদের এহেন আচরণ কল্পনাও করা যায় না। বিয়ের কথাবার্তা সবকিছুই আমাদের জানা ছিল। ঘর জামাইয়ের প্রশ্নই ছিল না। বিরজা সুন্দরী দেবীই সব অঘটন ঘটালেন।

(দুই) আমন্ত্রিত বাদ্যকর মনজুর আলী বলেছেন, সেনদের কারসাজিতেই বিয়ের আসরে গোলযোগ হয়েছিল। বিরজা সুন্দরী দেবীরা কবিকে এক রকম আর খানদের অন্যরকম বুঝাতে লাগলেন। তারা তো পারলে কবিকে বিয়ের আগেই ধরে নিয়ে যান এমন অবস্থা।

(তিন) দৌলতপুরের চান গাজীর কন্যা কবি পক্ষের বিয়ের সাক্ষী নজরুল স্নেহধন্যা বিদুসী বেগম উৎফতের নেসা বিদ্যা বিনোদিনী তার কাজীদার স্মৃতি কথায় লিখেছেন–

সারারাত আমি বিয়েবাড়িতে উপস্থিত ছিলাম। খাওয়া দাওয়া সেখানেই হয়েছিল। সেনদের চক্রান্তে সমগ্র বাড়িতে একটা থমথমে ভাব নেমে

নজরুলের জীবনে নার্গিস–৪ www.nagorikpathagar.org

এসেছিল। এত জাঁকজমকপূর্ণ বিয়ে কখনো দেখিনি। লোকে লোকারণ্য। আলতাফ আলী খান বাড়ির মুরব্বি ছিলেন। মানসম্মানের প্রশ্ন দেখা দেওয়ায় তিনি আলী আকবার খানকে গালিগালাজ করতে লাগলেন। নজরুল যে সেনদের ফাঁদে এত সহজে পড়বেন আর সেনরাও এসব ফাঁদ তৈরি করবেন, তা তো কেউ জানতো না। তখন সাদত আলী মাস্টার ও রায় বাহাদুর রূপেন্দ্র মজুমদার প্রমুখ সকলকেই স্বাভাবিক করলেন।

এরকম প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য অনেক ছিল সে সময়। অতিথি অভ্যাগতদের সহায়তায় শেষ পর্যন্ত বিয়ে হলো, বাসর হলো। কিন্তু দেবীরা তখনো হাল ছাড়লেন না। বাসর ঘরে প্রবেশ পথে তারা কবিকে পালিয়ে যেতে পরামর্শ দিলেন। দেবীদের কু-মন্ত্রণায় কবি বাসর ঘরে নববধূকে তার সাথে রাতেই পালিয়ে যাবার অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসলেন। অসম্ভব এ প্রস্তাবে কোন নববধূ রাজি হতে পারেন না। পারেন নাই নার্গিসও। চোখের জলে শত মিনতি করেও কবিকে নিবৃত্ত করতে পারেন নাই নববধূ নার্গিস।

ক্ষুব্ধ কবি দেবীদের সহিত পরামর্শ করার জন্য বাসর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। নাতনি ও নাত জামাইয়ের মান অভিমান মিটানো তো নানিদের কাজ। দেখা যাক এ ব্যাপারে নানীদের কি ভূমিকা ছিল সেদিন। সব শুনে বিরজা সুন্দরী দেবী বললেন, ওমা সে কি কথা? স্বামীর সাথে যেতে আপত্তি থাকবে কেন? আসলে ও মেয়ে অন্য কাউকে ভালোবাসে। তোমার সাথে ছলনা করছে মাত্র।

নববধূ নার্গিস নববর কবির সহিত পালিয়ে না গেলেও কবি ঠিকই গিয়েছিলেন। তবে গিয়েছিলেন পরদিন নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে। যাবার আগে বলে যান সামনের শ্রাবণে এসে নার্গিসকে কলকাতায় নিয়ে যাবেন। কবির কুমিল্লায় যাওয়ার দুইদিন পর দেবীরা ফিরেছিলেন কমরেড মোজাফ্ফরের আরোপিত মিশনের সফলতার গর্ব নিয়ে। একবারও ভেবে দেখলেন না নারী হয়ে আর এক নারীর কি সর্বনাশ করে এলেন।

বিবাহ ও বাসর বিষয়ক বিভ্রান্তি

পর্দার আড়ালে যা ঘটে তা দেখার ও জানার বিষয় নয়। তা সাধারণ্যের অনুমান আন্দাজ করার বিষয়। তেমনি একটি বিষয় হলো বাসর। এটি একটি অতি সংবেদনশীল বিষয়। এমনি একটি স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন কবি বন্ধু কমরেড মোজাফফর আহমদ। তিনি কখনো বলেছেন বিয়েটাই হয় নাই। কখনো বলেছেন বিয়েটাই অসম্পূর্ণ। কখনো বলেছেন আকদ হয়েছে মাত্র। আবার কখনো বলেছেন বিয়ে হয়েছে বাসর হয় নাই। নানা প্রকার ধূম্রজালে নজরুল নার্গিসের বৈধ বিয়েকে বিতর্কিত করে

www.nagorikpathagar.org

তুলেছিলেন। সারকথা তিনি না দেখে, না শুনে কপোল কল্পিত প্রশ্ন তুলে নিজেকে আড়াল করে গেছেন মাত্র। তার কথায় অন্যান্য কবি বন্ধু ও সুহৃদরাও বিষয়টি তলিয়ে না দেখে তাল মিলিয়ে ছিলেন। তলিয়ে দেখলে বিষয়টির সত্যতা উপলব্ধি ও সেই সাথে কমরেডের চাতুরতা ধরতে পারতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ওই কাজটি কেউ করেন নাই।

কেউ না দেখলেও আজ প্রায় শতবর্ষ পরে আমরা একটু তলিয়ে দেখি। স্বয়ং নার্গিস বলেছেন, বিয়ে হলো। বাসর হলো। ও আমাকে বাসর রাতেই তার সঙ্গী হয়ে দৌলতপুর ত্যাগ করতে বললো। কত মিনতি করলাম, তবু ভুল বুঝলো। ছুটে গেল বিরজা সুন্দরী দেবীর কাছে পরামর্শের জন্য। অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে সকালে (অর্থাৎ বিয়ের পরদিন ১৮ই জুন শনিবার) নাস্তা-টাস্তা সেরে বীরেন্দ্র কুমার সেনগুপ্তের সঙ্গে কুমিল্লায় রওয়ানা হলো। বললো, দেশের বাড়িতে যাবে। আত্মীয়-স্বজন নিয়ে এসে আমাকে শ্রাবণ মাসে নিজবাড়িতে নিয়ে যাবে- ইত্যাদি।

সূত্র : বুলবুল ইসলাম, অন্তরঙ্গ আলোকে কবি-প্রিয়া

এর চেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আর কী হতে পারে? বিয়ে হয়েছিল কিন্তু বাসর হয় নাই বিধায় বিয়েটা অসম্পূর্ণ বলে কমরেড় মোজাফ্ফর যে দাবি করেছিলেন তা কি ধোপে টিকে? পারিবারিক রেওয়াজ মতো মামাশ্বশুর মেজাবত আলী খান ও সাদত মাস্টার স্বাভাবিকভাবে কোম্পানীগঞ্জ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। এতে কি বাসর রাতে পালিয়ে যাওয়া বোঝায়?

এবার আমরা কবিপক্ষের সাক্ষী কবির স্নেহাধন্যা বেগম উৎফতের নিসা বিদ্যা বিনোদিনীর নিকট বিয়ে ও বাসর সম্পর্কে জানবো। দেখি তিনি কি বলেছিলেন–

আমি সারারাত বিয়ে বাড়িতে ছিলাম। খাওয়া দাওয়া ওখানেই হয়েছিল। এতবড় জাঁকজমকপূর্ণ বিয়ে কখনো দেখিনি। বিয়ে হলো। বিয়ে পড়ালেন মুন্সী আব্দুল জব্বার। উকিল হয়েছিলেন আলতাফ আলী খান। বর ও কনের সাক্ষী হলেন যথাক্রমে সাদত আলী মাস্টার ও সৈয়দ আলী মাস্টার। পঁচিশ হাজার (২৫,০০০) টাকার কাবিন হয়েছিল। বিয়ের পর পরই নজরুল নার্গিসকে বাসর ঘরে দেয়া হয়েছিল। পরদিন সকালে শুনলাম কাজীদা নার্গিসকে সেই রাতেই তার সাথে চলে যেতে প্রস্তাব করেন। নার্গিস তাকে অন্তত কয়েক দিন থেকে তারপর যেতে বললেন। শেষ পর্যন্ত কবি বীরেন্দ্র কুমারের সঙ্গী হয়ে চলে গেলেন। বলে গেলেন, কিছু দিনের মধ্যে ফিরে আসবেন।

www.nagorikpathagar.org

সূত্র : নজরুল স্মৃতি, দৈনিক সংগ্রাম

মোঃ বুলবুল

বাদ্যকর আলী নওয়াজ তুফানীর ছেলে মনজুর আলী কবির বিয়েতে বাদ্যকর হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তখন তার বয়স ২৮-২৯ বছর। তিনি বলেছেন, শেষ পর্যন্ত উপস্থিত গণ্যমান্য লোকদের চেষ্টায় পরিস্থিতি শান্ত হলো এবং বিয়ে ও বাসর হলো।

রায় বাহাদুর রূপেন্দ্র মজুমদার যিনি তার স্ত্রী শ্রীযুক্তা কিরণ বালা দেবীসহ কবির বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। তারা বিয়ে বাড়িতেই রাত্রিযাপন করেন। শ্রীযুক্তা কিরণ বালা দেবী তার এক চিঠিতে এরূপ মন্তব্য করেছেন–

কাজী সাহেব এর আগে আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। ঘনিষ্ঠতা ছিল উনার (তার স্বামীর) সাথে। সেই সুবাদে আমাকে বৌদি বলে ডাকতেন কাজী সাহেব। বিয়ের অনুষ্ঠানেও উনি (তার স্বামী) ও আমি কাজী সাহেবকে পাগলামী ছেড়ে বিয়ের কার্য সমাধা করতে অনুরোধ করি। শেষ পর্যন্ত বিয়ে ও বাসর হলো। পরদিন সকালে খাওয়া দাওয়া করেই তো কাজী সাহেব বীরেন বাবুর সহিত কুমিল্লায় যান। আমরা তার বিদায়ের ঘণ্টাখানেক পরেই এসেছিলাম।

সৌজন্যে : বুলবুল ইসলাম

দৌলতপুরের মৌলভী মুন্তল হোসেন তার কলমী পুঁথিতেও কবির বিবাহ ও বাসর এর সত্যতা পাওয়া যায়–

শেষ পর্যন্ত হইলো বিয়া, শোন বন্ধুগণ
বাসর ঘরে গেলো তারা জানো দুইজন
কাজী বলে শোন কন্যা শোন মন দিয়া
তোমার আমার হইল জান আজ রাইতে বিয়া।

নজরুল নার্গিস বিষাদময় আখ্যান অবলম্বনে দৌলতপুর অঞ্চলে অসংখ্য কলমী পুঁথি, কবিগান, দোহা, জারি-সারি গীত পঠিত হইতো। এখন সে সব অবলুপ্ত প্রায়। এখনো এ অঞ্চলে কান পাতলে নজরুল-নার্গিস ট্র্যাজেডির অনেক ছিটেফোটা অংশ শোনা যেতে পারে। এসব সংগ্রহ করে জনসম্মুখে আনার মতো সংগ্রাহক কোথায়?

কবি নিজেও নার্গিসমুখী অসংখ্য কবিতা ও সঙ্গীতে এ বিবাহ ও বাসরের স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। কবির ধনগীতি কবিতায় এ ঘোষণা স্পষ্ট–

বাসর শয়নে হারায়ে
তোমারে পেয়েছি চির বিরহে।

www.nagorikpathagar.org

নার্গিস ছাড়া আর কাকে কবি বাসরে হারিয়ে বিরহে খুঁজে পেয়েছেন। বাসর যদি না হয়ে থাকে তবে বাসর ঘরের আসবাবপত্রের প্রদর্শনী কেন আজ?

নার্গিস ও তার আত্মীয়স্বজন, বিয়ে মজলিসে উপস্থিত নারী-পুরুষ যখন সাক্ষ্য দেয় বিবাহ ও বাসর হয়েছে, তখন কমরেড মোজাফফর না দেখে না শুনে কি করে দাবি করে বিয়েই হয় নাই। এটা ধৃষ্টতা ছাড়া আর কি হতে পারে? তার এরূপ ধৃষ্টতার অনেকে প্রতিবাদে সোচ্চার ছিলেন সে সময়।

দূরত্ব সৃষ্টিকারী কে?

কবি মানস আর দশটা মানস থেকে আলাদা। তিনি দশের মধ্যে এক ও অনন্য। তিনি দশের সঙ্গে এগার নহেন। তার আচার আচরণ, তার ব্যক্তি জীবন আদর্শ ও অনুকরণীয়। তিনি সমাজ পরিবর্তনের প্রতিভূ। সামাজিক জীবনে তিনি যুক্তিবাদী, সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠাতা। একজন সচেতন দার্শনিক ভাবাদর্শের প্রতীক।

কবি তার বিয়ের খবর দিয়ে লেখা পত্রের উত্তরে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তার কিছু আশঙ্কা উৎকণ্ঠার অবতারণা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, তুই স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে তাকে বরণ করে নিয়েছিস। তখন আমার অবশ্য কোনো দুঃখ নাই। তবে একটা কথা তোর বয়স আমাদের চাইতে ঢের কম। অভিজ্ঞতাও তদনুরূপ। আর ফিলিংসের দিকটা অসম্ভব রকম বেশি। কাজেই ভয় হয়, হয়তবা দুটি জীবনই ব্যর্থ না হয়। এ বিষয়ে তুই কনসাস তাহলে অবশ্য কোনো কথা নাই। যৌবনের চাঞ্চল্যে আপতত মধুর মনে হলেও পরে পস্তাতে হয়। তুই নিজে যখন সব দিক ভেবেচিন্তে বরণ করাই ঠিক করেছিস, তাহলে একান্ত কারণে তোদের মিলন কামনা করি।

অতি অল্প দিনের মধ্যে পবিত্র বাবুর আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়েছিল। কবির কনসাসের বাহাদুরীর ভরাডুবি হয়েছিল। কবি যে এতগুলো সত্যকে এক নিমিষে অস্বীকার করে শ্বশুর পক্ষের ওপর সব দোষ চাপিয়ে নিজে ধোয়া তুলসী পাতা সাজতে পারলেন। এটাই ভাববার বিষয়। কোন মায়ামন্ত্রে বশীভূত হয়ে কবি বলতে পারলেন কয়েক ঘণ্টার জন্য বর সেজেছিলুম, যদিও বরের এখনো বধূর সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই। এই একটি বাক্যে কবি তার দৌলতপুরের আড়াই মাসের সব স্মৃতির সমাধি ঘটালেন এবং কবি তার বধূ প্রিয়ার সহিত সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে সাগর সমান দূরত্ব সৃষ্টি করে দিলেন।

অথচ কবিই বলেছিলেন– 'আমাদের মধ্যে যারা দূরত্ব সৃষ্টি করেছে, পরকালেও তারা মুক্তি পাবে না।' কবি কি মুক্তি পাবেন?

দূরত্ব সৃষ্টিকারীদের কবি চিনেছিলেন। বিবাহ উত্তরকালে কবি এদের মাঝে মিলেমিশে একাকার হয়েছিলেন। কুহকের মায়ার বন্ধন কাটিয়ে সত্যের

www.nagorikpathagar.org

কাছাকাছি আসার সাহসটুকু খঁজে পান নাই শুধু। দূরত্ব সৃষ্টিকারীদের চিনতে পেরেছিলেন বলেই লিখতে পেরেছিলেন-

এই গান, এই মালাখানি
রহিবে তাদের কণ্ঠে- যাহাদের কভু
চাহি নাই, কুসুমে কাঁটার মতো জড়ায়ে রহিল যারা তবু।

এ কুসুমে কাঁটা কে? এরা কবির নিয়তির অমোঘ বিধান। কবি এদের চান নাই কিন্তু এদের খপ্পর মুক্ত হবার চেষ্টাও করেন নাই। তাই কুসুমে কাঁটার মতো এরা জড়িয়ে ছিল কবির সারাটি জীবন।

অন্যত্র কবি লিখেছেন-

চিরতরে হলো ছাড়াছাড়ি
(কোন্) নিঠুর ব্যাধের শরে।

কে এই ব্যাধ? যে অন্তত ইহকালে এ যুগলকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল তার নিষ্ঠুর নখরাঘাতে। কমরেড মোজাফ্‌ফর আহমদ নয় কি? সিন্ধু কবিতায় কবি আরো লিখেছেন-

কারে তুমি হারালে কখন?
কোন মায়া মনিকার হেরিছ স্বপন।

কাকে, কখন হারালো কবি? কোন মায়া স্বপনে কবি বিভোর। এই সিন্ধু কবিতায় কবি বাস্তব জীবনের দিব্য সত্য প্রকাশ করে গেছেন-

মন্থন মন্দার দিয়া দস্যু সুরাসুর
মথিয়া লুণ্ঠিয়া গেছে তব রত্নপুর
হরিয়াছে উচ্চৈঃশ্রবা, তব লক্ষ্মী, তব শশী প্রিয়া
তারা সব আছে আজ সুখে স্বর্গে গিয়া
করেছে লুণ্ঠন-
তোমার অমৃত সুধা-তোমার জীবন ॥

কে এই দস্যু সুরাসুর? কে মথিত ও লুণ্ঠিত করেছে কবির রত্নপুর? কে হরণ করেছে কবির উচ্চৈঃ শ্রবা, কবি লক্ষ্মী, কবির শশী প্রিয়াকে? কে সে যে লুটিয়ে

www.nagorikpathagar.org

নিয়েছে কবির অমৃত ভাণ্ডার? কবির জীবন? যার জন্য কবির এত ক্ষুধা, এত উদগ্র সিন্ধু সমান পিপাসা, চারদিকে এত জল থেকেও কবির অনন্ত পিপাসা নিবৃত্ত হয় না। কে সে?

এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, দৌলতপুর ছিল কবির জীবনের পথ চলার মোহনা। এখান থেকে কবির চলার পথ দুদিকে বেঁকে গিয়েছিল। একটি ডানের, অন্যটি বামের। একটি সরল কুসুম বিছানো অপরটি বক্র ও কণ্টকাকীর্ন। একটি মঙ্গলের ও সমৃদ্ধির অপরটি মায়ার ও অনিষ্ঠের। একটির দিশারী আলী আকবার খান অন্যটির কমরেড মোজাফফর। একটি প্রান্তে হাতছানি কবি প্রিয়ার অপরটি মায়ার। একটির পথ প্রান্তে মাতৃময়ী এখতারুন নেসা অপরটির কূটকণ্টক বিছায়িনী বিরজা সুন্দরী দেবী। যে কোনো একটি পথ বেছে নেয়ার অগ্নিপরীক্ষা ছিল কবির। কবি যেমনটি বেছে নিয়েছেন তেমনি পেয়েছেন।

এ বাছাইয়ে কে হেরেছে আর কে জিতেছে তা বিচার্য বিষয় নয়। তবে এটা সত্য যে, এ বাছাইয়ে লাভ হয়েছে বাঙালি জাতির, বাংলা সাহিত্যের। বাংলা সাহিত্য বেদনাঘন আদিরসের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হতো। যেমন কবি বলেছেন–

তোমায় পেলে থামত বাঁশি
আসতো মরণ সর্বনাশী।

প্রেম বিদগ্ধ সাহিত্যের সর্বনাশ হতো। পরম পাওয়ায় কবি হৃদয়ের সুশান্ত সমাধি ঘটতো। ব্যথা কমলের উৎস মূল রুদ্ধ হয়ে যেত।

ষড়যন্ত্র ও ফলাফল

প্রকাশ থাকে যে সেনদের সাথে কমরেড মোজাফফরের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল রাজনৈতিক কারণে। গিরিবালা সেনগুপ্তাকে কমরেড মোজাফফর রাজনীতিতে ব্যবহার করতেন মর্মে তার **নজরুল স্মৃতি কথায়** উল্লেখ পাওয়া যায়। (৩৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্ঠব্য)

কমরেড মোজাফ্‌ফর ও সেনদের ষড়যন্ত্রের বিষয় প্রকাশ পেয়েছিল অনেক পরে, ততদিনে যা হবার নয়, তাই হয়ে গেল। একটি নির্মল প্রেম ও নিস্পাপ জীবন হতাশার গভীর আবর্তে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। অজানিত কারণে সেন পরিবারের কর্তা ইন্দ্র কুমার ও তার পুত্র, আলী আকবার খানের সতীর্থ বীরেন্দ্র কুমার নীরব ভূমিকা পালন করেছিলেন। বীরেন্দ্র কুমারের মাধ্যমেই আলী আকবার খান চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও কমরেড় মোজাফফর কর্তক বিয়ে পণ্ড করে দেয়ার নির্দেশপত্র বিষয়ে অবগত হয়েছিলেন। তবে অনেক পরে। কুমিল্লার ড.

www.nagorikpathagar.org

রাসমোহন চক্রবর্তী ও সুলতান মাহমুদ মজুমদার প্রমুখ কবি বন্ধু ও হিতৈষীগণ এ ষড়যন্ত্রের বিষয়ে অবগত হন অনেক পরে। তখন আর করার কিছুই ছিল না। কুমিল্লা ও দৌলতপুর এলাকার যারা এ ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হয়েছিলেন, তাদের ঘৃণা ও অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছিল কমরেড মোজাফ্ফর ও সেনদের উপর।

এতবড় সর্বনাশের পরও কমরেড মোজাফফর এর কুটিল ষড়যন্ত্রের শেষ হয় নাই। তিনি অত্যন্ত সুকৌশলে কবির মন ও মানস পরিবর্তিত করে দিয়েছিলেন যাতে নার্গিস ও তার আত্মীয়-স্বজনরা সম্পর্কের ছেঁড়া তার জোড়া লাগাতে না পারে। এমন কি নার্গিস ও স্বজনদের নামে নানা কুৎসা ও চরিত্র হননের অভিযোগ তুলতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। যার ফলে হৃদয়ের ধ্যানলোকে যে নার্গিসকে অনায়াসে পেতেন কবি, যে কবির একমাত্র লেখনীর কেন্দ্রকিন্দু, অথচ হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে নিতে পারতেন না। সে সাহসও কবির ছিল না। দুঃসহ বোবা গোঙ্গানী নিয়ে চির অতৃপ্ত কবিকে চলে যেতে হয়েছে। তার প্রেম বিদগ্ধ যন্ত্রণা কাতর কবিতা ও সঙ্গীতেই তার প্রমাণ মেলে।

কবির রচনা সামগ্রীর উপরও কমরেড় মোজাফ্ফরের নগ্ন হস্তক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়। দৌলতপুর ও নার্গিস সম্পৃক্ত লেখা নামকরণ ও লেখার অন্ত নির্হিত প্রেক্ষিত, লেখার সংখ্যা ও স্থান নির্দেশের উপরও মোড়লী করেছেন তিনি। নার্গিস সংস্পর্শের সকল চিহ্ন মুছে ফেলার মানসে তিনি উঠে পড়ে নেমেছিলেন। এটা তার কুটিল মানসিকতার পরিচায়ক।

বিয়ে ভেঙ্গে যাবার পরও নার্গিস ও তার আত্মীয়-স্বজনদের কবি সম্মান করতেন। সমীহ করতেন। কিন্তু কমরেড় মোজাফ্ফর আমৃত্যু নার্গিস ও তার স্বজনদের নামে মিথ্যাচার, অপবাদ, দোষারোপ ও হেয় প্রতিপন্ন করে গেছেন। নানা ধূম্রজাল বিস্তার করে আড়ালে নিজেকে সম্মান ও নিরাপদে অবস্থান করার অপকৌশল অবলম্বনে তার জুড়ি মেলা ভার।

যারা ফুটন্ত পুস্পরাজি বৃন্ত চ্যুত করে তারা নিষ্ঠুর। যাবার কূটকৌশলে অপরের সর্বনাশ করে তারা কূটনী। কুমিল্লার দেবীরা দুই-ই। তারা নির্লজ্জ ও নিষ্ঠুর কূটনী ছিলেন। নার্গিসের হাতের মেহেদীর দাগ না মিশতেই লজ্জার মাথা খেয়ে দোলনকে মুসলমান কবির কাছে লেলিয়ে দিয়েছিলেন। আবার তারাই যবন ম্লেচ্ছ এর হাতে কন্যাদান নিশ্চিত নরকবাস, এ মহামন্ত্র প্রচার করতেন।

যে ঘর জামাই প্রশ্নে কবির আত্মঅহমে আঘাত লাগে, শিরীষ ফুলের পরাগের মতো কোমল হৃদয়ে খোঁচা লাগলে আর যিনি, তিনি থাকেন না। সেই কবি কেমন করে দেবীদের ম্লেচ্ছ, যবন গালি খেয়ে, দেবীদের ঝাঁটা তিরস্কার

www.nagorikpathagar.org

হজম করে দেবীদের বাড়িতে দিনের পর দিন পড়ে ছিলেন। তখন কবির ম্যানলিনেস কি ঘুমিয়ে ছিল?

ব্যক্তিমাত্রই সমালোচিত হতে পারেন। তা সে কবি হোক কিংবা অকবি। দুটি ধারায় কবি সমান অভিনয় করে গেছেন। হাত বাড়ালেই যে চাঁদকে তিনি অনায়াসে পেতে পারতেন, সেই হাত বাড়ানো থেকে বিরত থাকেন তিনি। কাছের চাঁদকে দূরে ঠেলে দিয়ে, আজীবন সে চাঁদের জন্য আকুতি আরাধনা করে গেছেন।

মাতৃস্নেহ অন্বেষায় কবি পথে পথে ঘুরেছেন, তার লেখনীতে এ আভাস মিলে। মাতৃরূপকে সম্মান দেবার ব্যক্তিত্ব কবির কোথায়? নইলে আপন মাকে অনাদরে, অসম্মানে, রেখে মাতৃময়ীর বিশুদ্ধ মাতৃপিযুষকে পায়ে ঠেলে মায়াময়ীকে মাতৃ সম্মানে আজীবন পূজা-অর্চনা করতেন না।

কমরেড মোজাফ্‌ফর একজন ঝানু মনস্তত্ত্ববিদ। তার নির্ভুল হিসাবের উচ্চ প্রশংসা করতে হয়। তিনি কবি চরিত্রের দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। কবি যে বিষয় বুদ্ধিতে অপরিপক্ক ও পরনির্ভরশীল, কবি যে কান কথায় স্পর্শকাতর কমরেড মোজাফ্‌ফর তা সঠিকভাবে ধরতে পেরেছিলেন। তাই আজীবন কবির অভিভাবকত্ব করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্যদিকে আলী আকবার খানরা না চিনে পথ চলেছেন, না শুনে পা ফেলেছেন। তাই কাঁটার আঘাত সয়েছেন শুধু কুসুম তুলতে সক্ষম হন নাই।

ষড়যন্ত্রের এ খেলায় জয় হয়েছে কমরেড় মোজাফ্‌ফর আহমদের। বিজয়ের সোনালী ফসল তিনি ঘরে তুলেছিলেন। অন্যদিকে পরাজয়ের ব্যর্থতা, গস্নানি, অসম্মান ও অপচয়ের বোঝা মাথায় নিয়ে জীবন কাটিয়ে গেছেন আলী আকবার খানরা। এটাই নিয়তির পরিহাস!

ঘুমন্ত বিসুভিয়াসের অগ্নি উদ্‌গিরণ

কলকাতায় এলেন কবি। কুমিল্লা থেকে বয়ে আনলেন ব্যথাদীর্ন যন্ত্রণাকাতর বিক্ষুব্ধতা। তাতে যুক্ত হলো পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ দেশমাতৃকার গস্নানি ও বঞ্চনা। ঠিক এ সময় গ্রেফতার ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন তার প্রিয় নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। এ সময় কবি দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ক্ষ্যাপা দুর্বাশার ন্যায় ভয়ঙ্কর রূপে ফেটে পড়লেন কবি। মনে হয়েছিল যেন জেল ভেঙে প্রিয় নেতাকে মুক্ত করে আনবেন তিনি। প্রত্যয় দৃপ্ত স্ফুলিঙ্গে জ্বলে উঠলো তার বহ্নি সৃষ্টি শিকল ভাঙার গান–

> কারার ঐ লৌহ কবাট
> ভেঙে ফেল, কর রে লোপাট

www.nagorikpathagar.org

রক্ত-জমাট
শিকল-পুজোর পাষাণ-বেদী!
ওরে ও তরুণ ঈশান
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ!
ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি।

সহসা তার কবিসত্তা প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো। উল্কার ন্যায় ভারতের পরাধীন অন্ধকার আকাশে এক ঝলক উল্কার আলোর মতো জ্বলে উঠলো। এ সময় তিনি বিদ্রোহী লিখে এক মহাবিদ্রোহীতে পরিণত হলেন। এ সময় ধূমকেতু প্রকাশনায় হাত দিলেন তিনি। তার নিজস্ব পত্রিকা 'ধূমকেতু'। নির্যাতিত ও নিপীড়িত ভারতের আকাশে ধূমকেতু যেন আশার আলো নিয়ে উদয় হলো। কবিগুরু এ ধূমকেতুকে স্বাগত জানালেন।

ধূমকেতুতে তিনি লিখলেন আনন্দময়ীর আগমনী। পড়লেন ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে। পত্রিকা বাজেয়াপ্ত হলো। তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলো। কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার হলেন তিনি। নিক্ষিপ্ত হলেন ব্রিটিশ কারাগারে। এতে তিনি কিংবদন্তি মহাবিদ্রোহীতে পরিণত হলেন। কারাগারে বসে তিনি লিখলেন–

এই শিকল পরা ছল, মোদের এই শিকল পরা ছল
শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল
শিকল পরা ছল, মোদের এই শিকল পরা ছল।

লিখলেন রাজবন্দির জবানবন্দি, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের মুক্তিপাগল জনমনে ঘূর্ণিমাতাল এক প্রলয়ঙ্করি ঝড় তুললেন। কাঁপন তুললেন শোষকের উপনিবেশিক ভিত্তিমূলে। এ সময় কবির আরুদ্ধ কবি প্রতিভার উৎস মূল যেন সহসা খুলে গিয়েছিল। অগ্নিগিরির চাপা লাভা যেন সহসা উদ্গিরণ শুরু করেছিল। একের পর এক অগ্নি স্ফুলিঙ্গ যেন ঘুমন্ত ভারতবাসীর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। অরুণোদয়ের মহাউত্থানে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল তারা। এ সময় কবিগুরু এক অভাবিত উৎসাহ প্রদান করে বসলেন কবির প্রতি। তিনি তার বসন্ত নাটকটি কবির নামে উৎসর্গ করে তাকে মহামহিম এক আসনে সমাসীন করে দিলেন।

যেখানে বঞ্চনা, নিপীড়ন, অসত্য ও অসুন্দর সেখানেই কবি কণ্ঠ উচ্চকিত। অগ্নিগিরির তৈজদৃপ্ত কবির লেখনি–

www.nagorikpathagar.org

অগ্নিগিরি ঘুমন্ত উঠিল জাগি
বহ্নি রাগে দিগন্ত গেলরে রাঙ্গিয়া ॥
রুদ্ধ রোষে কি শঙ্কর উঠির পানে
লক্ষ ফণা ভুজঙ্গ বিদ্যুত হানে ॥
দীপ্ত তেজ অনন্ত নাগের মুস ভাঙ্গিয়া ॥

লঙ্কা দাহন হোমাগ্নি সাগ্নিক মন্ত্র,
যজ্ঞ ধূম ওঙ্কার ছাইল অনন্ত।
খড়গ পানি শ্রীচণ্ডী অরাজক মহীতে,
দৈত্য নিশুম্ভ শুম্ভে এলো বুঝি দহিতে।
বিশ্ব কাঁদে প্রেম ভিক্ষু অনন্ত মাগিয়া ॥

নব চেতনার, নব জাগরণের, নবযুগের সূচনা করলেন কবি। যুগের তাগিদে এসেছিলেন। তাই তো যুগ স্রষ্টা কবি তিনি। কবি কিন্তু নবী নন। কবি কণ্ঠে প্রকাশ পায় সত্য ও সুন্দর। পতিত ও নিপীড়িত মানুষের জন্য যুগে যুগে ঈশ্বর তার অবতার পাঠিয়ে থাকেন। পরাধীন ভারতে কবির আগমন এমনি এক নিশ্চিত সত্য কিনা কে জানে। কবি যেমনটি লিখেছেন–

আমি যুগে যুগে আসি
আসিয়াছি পুনঃ
মহাবিপস্নব হেতু
আমি স্রষ্টা শনি মহাকাল ধূমকেতু ॥
(অগ্নিবীণা)

ঋতুর চাকায় দোলে প্রিয়ার মন

আষাঢ়ের ঘন বরষায় উদ্বেল প্রিয়ার মন। শুরুতে যে বর্ষার সূচনা আজও তার শেষ নেই। জলে থই, থই পথ ঘাট। ঘন দেয়া ডাকে। বাদলের ধারা ঝর ঝর নির্ঝর ঝরে সারাদিন। বিরাম নাই, বিরতি নাই। সাথে ঝরে বিরহ ব্যাকুল প্রিয়ার আঁখি জল। ভারে, ভারে মেঘ ছুটে চলেছে দূরে, বহুদূরে। মনে মনে ভাবেন প্রিয়া, এই মেঘকেই তো দূত করে পাঠিয়েছিল বিরহী যক্ষ প্রিয়া। প্রিয়া মেঘমালাকে তার দূত করে পাঠাতে চান কবির কাছে। যেখানে কবি তাকে ভুলে আছেন–

পরদেশী মেঘ যাওরে উড়ে
বলিও আমার পর দেশীরে।

www.nagorikpathagar.org

আষাঢ়ের পর আসে শ্রাবণ। এই শ্রাবণেই কবি ফিরে আসতে চেয়েছিলেন। আসার পথ চেয়ে বেসে থাকেন প্রিয়া। শ্রাবণের অঝোর বর্ষণের সাথে ঝরে প্রিয়ার অশ্রুধারা। দূর গাঁয়ের পথে কে যেন এদিকে আসছে। কবি বলে মনে হয়। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে প্রিয়ার। দূরের পথিক কাছে আসে। দৃষ্টিভ্রম দূর হয় প্রিয়ার। গুমরে কেঁদে উঠে প্রিয়ার অবুঝ মন। নিঃসঙ্গ বিধরা বধূর স্বপ্ন ভেঙে খান-খান হয়ে যায়। আঁখি নীরে গেয়ে উঠেন প্রিয়া–

শাওন আসিল ফিরে
সে ফিরে এলো না।

বৃষ্টিঝরা নুপুর পরা শাওন রাত। বাতায়নে চোখ রেখে নিশি জাগেন প্রিয়া। কত কথা মনে পড়ে যায়। কত টুকরো টুকরো স্মৃতি প্রিয়ার বিরহী মনে টুং টাং জলতরঙ্গ তুলে যায়। আধেক মুখের আধেক বুকের অস্থির কত কথা প্রিয়ার হৃদয় গবাক্ষে উঁকি দিয়ে যায়। ব্যথাদীর্ণ আঁখি জল বাঁধ মানে না। আপন অজান্তে প্রিয়া ব্যথা সুরে গুণগুণিয়ে উঠে–

শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে
বাহিরে ঝড় বহে হৃদয়ে বারি ঝরে।

বর্ষার পর আসে শরৎ। পিক পাপিয়ার মুখরিত গানে বিভোর হয় নির্মল প্রকৃতি। গাছে গাছে চঞ্চল ফিঙে দোলে। শিউলি, বকুল আর শাপলা নীপ নীড়ে গুঞ্জন তুলে মৌ প্রিয়া গায়। শিউলি ফোঁটা দিন এলো, এলো না প্রিয়ার মিলন মধুর দিন। শিউলির মালা গাঁথেন প্রিয়া। বড় সাধ জাগে নিজ হাতে কবির গলায় পরিয়ে দেবে। কিন্তু হায় কবি কোথায়? কোন বিপিণে, কোন মথুরায়। সাঁঝের বেলা চোখের জলে গোমতীর জলে ভাসিয়ে দেয় প্রিয়া তার মধুরের উদ্দেশে। গাঁথা মালার সাথে কথার মালা গেঁথে দেয়। হয়তো কবি পাবেন। পেয়ে বুকে তুলে নেবেন। শিহরিত হয়ে উঠেন প্রিয়া। আনন্দে গুণগুণ করে গেয়ে উঠেন–

শিউলি মালা গেঁথেছিলাম
তোমায় দিবো বলে
না নিয়ে সে মালা নিঠুর
তুমি গেলে চলে।

www.nagorikpathagar.org

ভাদ্রের মরা নদী কূল কূলে উছলায়। কুমুদ ও কমল মিটমিটিয়ে চোখ তুলে চায়। এমন দিনেও ঘরে ফিরে আসে না কবি। আলু থালু বালিকা বধূর চোখের জল ফুরায় না। ভাদ্রের দিন কাটলেও রাত কাটে না প্রিয়ার। একে তো বিধুরা একেলা বালা তাতে কালা উথলা মাতওয়ালা ভাদ্র রাত। আঁখির জলে কেটে যায় এক একটি বেদনাক্লিষ্ট ভাদ্রর বিধুর রজনী–

ঘন দেয়া গরজায় গো-
কেঁদে ফিরে পূবালী বায়।
একা ঘরে ঘুম, ডর লাগে
কার বিধুর স্মৃতি মনে জাগে।
বারিধীরে কাঁদে চারি ধার-
সে কোথায়, আজি সে কোথায়।

গগনে বরষা ভারি
তবু তৃষ্ণা গেল না আমারি
কোন দূর দেশে, প্রিয়তম
এ বিরহ বরষায়।

শীতের ওড়না পরে পায়ে পায়ে আসে হেমন্ত। আমন ধানের শীষে শীষে দোলা দিয়ে যায় ক্ষ্যাপা উথরী বাও। অঘ্রাণে মৌ মৌ নবান্ন সুবাস মাতোয়ারা করে তুলে চারদিক। গাঁয়ের বৌ-ঝিরা নাইয়র আসে নাইয়র যায়। কেবল নাইয়র হয় না প্রিয়ার। অবুঝ বেদনায় কেঁদে উঠে–

হৈমন্তিক এস এস
হিমেল শীতল বনতলে
শুভ্র পূজারিণী বেসে
কুন্দ করবী মালা গলে।

আসে ঋতুরাজ। প্রকৃতি সাজে নবীন সাজে। কিষলয়ে জাগে কাঁপন। ফুলে ফুলে সাজে বনভূমি। গাছে গাছে সরব কাকুলী কুজনে। সুরে সুরে প্রাণ ভরপুর শূন্য কেবল প্রিয়ার মন। উদাস চোখে চেয়ে থাকে দূরের মাঠে। বসন্ত যেন সুরের আর রূপের পশরা বিছায়ে দিয়েছে। এতকিছুর মাঝেও নিসঙ্গতায় ডুবে যায় প্রিয়া। উচাটন হয়ে উঠে তার মন। কান পেতে শোনে মাঠের রাখালি গান–

www.nagorikpathagar.org

আবার ফাগুন এসেছে ফিরিয়া
তুমি তো এলে না হায়,
শূন্য দেউল নাহি জ্বলে ধুপ
প্রদীপ নিভিয়া যায়।

কথা ছিল ফাগুনে দেখা হবে। ফাগুন তো ফুরায়। প্রিয়া কেঁদে উঠেন। বোবা সে কান্না, মুখ ফুটে বেরোয় না। শুধু বুকে জমে বেদনার জগদ্দল। প্রকাশের ভাষা পায় না। রাখালি বাঁশির সুরে সে কথা সুর খুঁজে পেলো। প্রিয়া কান পেতে শোনে–

সেদিন বলেছিলে সেই সে ফুল বনে
আবার হবে গো দেখা, ফাগুনে তব সনে।

বিরহিণীর শূন্য হিয়ার ঘূর্ণি তুলে আসে চৈত্র। আম কাঁঠালের মুচি ও মৌউলের মৌ-মৌ বিভোর প্রকৃতি। দূর বনে বৌ পাগল, মৌ প্রিয়া আর বউ কথা কও ডাকে। উতলা হয় উদাস বন। ঝরা পাতা মচ মচিয়ে খেলে দোয়েল আর কোয়েল। মহুল বনে বৌ কথা কও ডাকে। সে ডাকে উদাস হয় প্রিয়ার মন। কোন বিদেশির আকুল করা গানের সুর ভেসে আসে। প্রিয়া উৎকর্ণ হয়–

চৈতী চাঁদের আলো আজ ভালো নাহি লাগে
তুমি নাই মোর পাশে, সেই কথা মনে জাগে।

প্রিয়ার হৃদয় কাঁদে। ভয় হয়, হয়তো তার কবি অন্য কোথাও, অন্য কোনো মনে বাসা বেঁধেছে। তাই আসছে না। মাসে মাসে ঋতুর চাকায় ঘুরে যায় একটি বছর। কবি ফিরে আসে না। আশা নিরাশায় পথ চেয়ে থাকেন প্রিয়া। যদি কোনোদিন তার হারিয়ে যাওয়া মধুর ফিরে আসে। এসে তার আঁখির ধার মুছে তাকে বউ বলে বুকে তুলে নেয়। সেই সে দিনের আশায় নয়ন ভরা জল আর আঁচল ভরা ফুল নিয়ে কবির প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকেন প্রিয়া।

দোলননামা

পূর্বোক্ত দুলী বা দোলনের বাবা ছিলেন বসন্ত কুমার সেনগুপ্ত। তিনি ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বড় ভাই। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের নায়েব ছিলেন। সপরিবারে ত্রিপুরায় বাস করতেন। দোলনের জন্মের পরই তিনি ত্রিপুরায় মারা যান। অসহায় বিধবা গিরিবালা সেনগুপ্তা দোলনকে নিয়ে কুমিল্লার কান্দিরপাড়ায় ফিরে আসেন। দেবর ইন্দকুমারের ভিটায় ঘর বেঁধে বসবাস করতে থাকেন।

www.nagorikpathagar.org

বিয়েবাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে বিরজা সুন্দরী দেবীর সাথে দৌলতপুরে গিয়ে ছিলেন গিরিবালা কিশোরী দোলনকে নিয়ে। কলকাতা থেকে দৌলতপুরে আসার পথে পরে বিয়েবাড়িতে এদের সাথে কবির আলাপ পরিচয় ঘটে। বিয়ের পরদিন দৌলতপুর থেকে কুমিল্লায় এসে বেশ কদিন কবি কুমিল্লায় অবস্থান করেন। সম্ভবত এ সময় থেকে দোলনের সহিত কবির প্রণয়ের সূত্রপাত ঘটতে থাকে।

গিরিবালা দেবী অজানিত কারণে এদের বিষম প্রণয়ে বাধা দেন নাই বলতে গেলে প্রায়ই প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। কবির বিয়ে বিয়োগান্তক রূপ নিলে কবি যে কয়েকবার কুমিল্লায় গিয়েছিলেন সে কেবল এ প্রণয়ের স্বার্থে। কবির প্রথম প্রকাশিত দোলনচাপা গ্রন্থটির নামকরণও সম্ভবত এ প্রণয় মানস ক্রিয়াশীল বলে প্রতীয়মান হয়।

কুমিল্লায় গিয়েছিলেন কবি, যাননি দৌলতপুরে নার্গিস নীড়ে

১৯২১ হতে ১৯২৪ এ সময় কবি বেশ কয়েকবার কুমিল্লায় গিয়েছিলেন কিন্তু একবারও যান নাই দৌলতপুরের নার্গিস নীড়ে। যাবার প্রয়োজনও মনে করেন নাই। যদিও নার্গিসের পত্রের উত্তরে বলেছিলেন আসছি। মামাশ্বশুর আলী আকবার খান স্বীয় অভিমান ভুলে কলকাতায় গিয়ে কবিকে দৌলতপুর আসার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। উত্তরে কবিও দৌলতপুর যাবার অঙ্গীকার করেও যান নাই।

এর মধ্যে কয়েকবার গিয়েছিলেন কুমিল্লায় কবি। থেকেছেন কান্দিরপাড়ায়। এ সময় সম্ভবত গভীর প্রণয় চলছিল সেন পরিবারের দুলীর বা দোলনের সাথে। আর সে কারণে কুমিল্লায় কবির ঘন ঘন আগমন ঘটেছিল। যদিও এরূপে আগমন উচিৎ ছিল দৌলতপুরে কিশোরী বধূর সান্নিধ্যে।

কুমিল্লার কান্দিরপাড়ায় কবির আসা যাওয়ায় খবর পেয়ে অভিজাত্যাভিমানী প্রিয়ার হৃদয়ে হিংসার উদ্রেক হয়েছিল। প্রিয়ার সে অভিব্যক্তি মূর্তিময় রূপ পেয়েছে কবির লেখায়–

সেকি হেথায় আসতে পারে আমি যেথায় আছি বেঁচে
যে দেশে নাই আমার ছায়া এবার সে সেই দেশে গেছে।

অঞ্জলি লহ মোর

সুন্দরী, বিদুষী, ধনগর্বিনী কবি প্রিয়ার অভিমান টুটে গেলে এক সময় মামার হাতে কলকাতায় কবির নিকট পত্র দিলেন প্রিয়া। অনুনয় বিনয় করে অনুরোধ

www.nagorikpathagar.org

জানালেন কবি যেন দৌলতপুরে ফিরে আসেন। সে পত্রের উত্তরে কবিও লিখেছিলেন আসছি। কিন্তু আসেন নাই।

আলী আকবার খানও কলকাতায় কবিকে দৌলতপুরে যাওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার অনুরোধ করেছিলেন। কবিও তার উত্তরে দৌলতপুরে যাবেন বলে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন, তথাপি আসেন নাই। খাঁ বাড়ির ছোট বাচ্চারা যাদের নিয়ে কবি খেলতেন, হই হুল্লোড় করতেন, শিশু পাঠ্য কবিতা লিখতেন, সেই শিশুরাও দৌলতপুরে আসার জন্য কবিকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন। তথাপি কবি দৌলতপুর এলেন না।

এমতাবস্থায় কবি যে আর দৌলতপুরে আসবেন না, এ সত্য ধরে নিয়ে সকলে বিফল মনোরথ হয়ে পড়লেন। শেষবারের মতো আলী আকবার খান কলকাতায় কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে দৌলতপুরে নার্গিস সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য নানা যুক্তি ও দাবি জানালেন। কবিও দৌলতপুরে যাবার পূর্বে পত্র দ্বারা জানিয়ে যাবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন। এবারও অজানিত কারণে কবি দৌলতপুরে যান নাই। এমনকি পত্র দ্বারা জানাবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। কবির সহিত সকল সংযোগ ব্যর্থ হলে কবি বধূ হতাশায় ভেঙে পড়েন। এ সময়কার কবি বধূর মানসিক অবস্থা প্রকাশ পেয়েছিল কবির লেখায়–

হে বসন্তের রাজা আমার
নাও এসে মোর হার মানা হার
আজ যে আমার বুক ফেটে যায়, আর্তনাদের হাহাকারে
দেখে যাও আজ পাষাণী কেমন করে কাঁদতে পারে।

শেষবার কবির সহিত সাক্ষাৎকালে আলী আকবার খান একটা মোটা অঙ্কের টাকার তোড়া নাড়াচাড়া করছিলেন। ভাবখানা এরূপ ছিল যে কবি ইচ্ছা করলে দৌলতপুর যাবার বিনিময়ে এ অর্থ নিতে পারেন। অভাব যার নিত্যসঙ্গী, সেই কবি এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শুধু প্রত্যাখ্যান করেন নাই, কুমিল্লায় বিরজা সুন্দরী দেবীকে পত্র দ্বারা জানিয়েছিলেন–

'মা, আলী আকবার খান আমাকে টাকা দিয়ে কিনতে চেয়েছিল'

উপরোক্ত তথ্যটির প্রচারক কমরেড মোজাফ্ফর আহমদ। সেন পরিবারে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন কবি। বিরজা সুন্দরী দেবী আশ্রয় দিতেন কিন্তু এ বিষম প্রণয় পছন্দ করতেন না। স্মেচ্ছ স্মরণ বিজাতির সাথে হিন্দু কন্যার মেলামেশ, প্রেম ও প্রণয় শাস্ত্র মতে মহাপাপ। নানা প্রকার গালিগালাজ, নিগ্রহ বিপত্তি হজম করে কবি সেন পরিবারে যাতায়াত অব্যাহত রেখেছিলেন। কবির

www.nagorikpathagar.org

এ সেন পরিবারে অবস্থান ও প্রণয়াচার অন্যকেউ পছন্দ করেন নাই। তবে এ বিষম প্রণয়ের একমাত্র বান্ধব ছিলেন দোলনের মা গিরিবালা।

বিপত্তি বেধেছিল ঘরে-বাইরে। মুসলমান কবির হিন্দু বাড়িতে অবস্থান, তার উপর হিন্দু কন্যার সহিত চুটিয়ে প্রেম প্রণয়, ঢলাঢলী, ধর্মীয় উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। এর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে উত্তপ্ত হয়েছিল কুমিল্লা। জাত গেল, ধর্ম গেল বলে শঙ্কিত প্রবীণরা আর নবীনরা এ ধরনের অনাচার প্রতিরোধে ব্রতী হয়েছিল। যার ফলে কবির অবস্থান ও যাতায়াতের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয়েছিল।

মুসলমান কবি হিন্দুকন্যা দোলনকে কোনোদিন পাবেন না, কবি নিজেও জানতেন। জানতেন দোলন ও তার মা। কিন্তু প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণে নানা প্রতিকূলতার মাঝেও চালিয়ে যাচ্ছিলেন প্রণয়াভিসার। প্রেম কোনো রীতিনীতি মানে না। মানে না জাতি ধর্মের সীমানা। কবি জানতেন, এ প্রেম এ প্রণয় পরিণতি লাভ করবে না। চির না পাওয়ার অন্তহীন বেদনা কবির উপলব্ধিতেও প্রকাশ পায় এভাবে–

বুকে যারে পাই, হায়
তারি বুকে তাহারি শয্যায়
নাহি পাওয়া হয়ে তুমি কাঁদো একাকিনী
ওগো মোর প্রিয়ার সতিনী।
(পূজারিণী)

দোলনের প্রেম কোনোদিন পরিণতি পাবে না। কবি তা জানতেন। তাই কবি হৃদয় হতাশায় বেসুরো বেজেছিল। প্রত্যাশার এ এক মর্মান্তিক সমাধি। সেই অব্যক্ত বেদনা সাগরের জলে দাঁড়িয়ে কবির বেসুরো বাণী নীলকমল হয়ে ফুটে উঠেছিল এভাবে–

মোদের দুজনার জনম ভরে কাঁদতে হবে গো
মোরা কে যে কত ভালোবাসি কোনোদিন হবে না তা বলা
কভু সাহস করে চিঠির বুকে আঁকবো না সে কথা
শুধু কইতে নারার প্রাণ পোড়ানী- রইবে দোহার বুকের তলা।

কবির সহিত আলী আকবারের ঐ সাক্ষতের আরো মজার তথ্য দিয়েছেন কমরেড মোজাফ্‌ফর আহমদ। তথ্যটি মিথ্যা ও বানোয়াট। সাক্ষাতের সময় আরো কজন উপস্থিত ছিলেন। কোনো সূত্রে তথ্যটির সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় নাই।

www.nagorikpathagar.org

বিরজা সুন্দরী দেবীকে লেখাপত্র (যা মায়ের নিকট শিশু অভিযোগের মতো) তাও সত্য নয়। পত্রটিও পাওয়া যায় নাই। কমরেড মোজাফ্‌ফর আহমদ অতি নিপুণ হাতে তথ্যটি পরিবেশন করেছেন। খাঁদের হেয় প্রতিপন্ন করা এর লক্ষ ও উদ্দেশ্য।

দীর্ঘ বিরহে বিধুরা কবি প্রিয়া

বিরহ দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে লাগলো। কবিকে দৌলতপুরে নার্গিস নীড়ে ফিরে আনার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। তবু প্রিয়ার প্রতীক্ষার শেষ হলো না। প্রতীক্ষার অন্ত নাই। চোখের জলে পথ চেয়ে থাকেন প্রিয়া। তার বিশ্বাস কবি একদিন ফিরে আসবেন। কবিই তো সে অঙ্গীকার করে গেছেন–

সেই সে বিদায় ক্ষণে
শপথ করিলে বন্ধু আমার রাখিবে আমায় মনে
ফিরিয়া আসিবে খেলিবে আবার সেই পুরাতন খেলা।

কবির অঙ্গীকারের বাণী বুকে নিয়ে কাটে প্রিয়ার দিন। কবির কবিতা আর গানে আঁখির জলে পথ চেয়ে থাকেন প্রিয়া। দীর্ঘ বিরহ বেদনায় পুড়ে পুড়ে প্রিয়ার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল। মনে হয়েছিল কবি হয়তো অন্য কোথাও অন্য কোনোখানে বাসা বেঁধেছেন। কবির লেখনিতে প্রিয়ার এ ভাবান্তর ফুটে উঠে–

দূরে বাঁশি বাজে পলাশ পিয়াল বনে
সে মোরে ভুলে নাচে কাহার সনে
বুঝি সই বধূ মোর কেন লাজে মরে
সে যে জানতো না সজনী
কভু আমা রই ॥

কুমিল্লা থেকে মামাশ্বশুর আলী আকবার খানকে লেখা পত্রে একটি বিষয় আঁচ করা যায় যে, বাসর ঘরে কিছু একটা ঘটে গিয়েছিল, যা কবির আত্মঅহমে নিদারুণ আঘাত হানে; পরিণামে কবি কুমিল্লায় চলে যান। এ বিষয়ে বেগম সামসুন নাহারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। বিয়ের রাতে কুমিল্লা যাওয়া সম্পর্কে বলেছেন, কবির বিষয় বৈভব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। দাস-দাসীরা পর্যন্ত কবিকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে ছাড়ে নাই। নার্গিসও পরিবার ও পরিবেশের স্রোতে মিলেমিশে ছিলেন। তিনি কবিকে অবজ্ঞার নির্মম কশাঘাতে জর্জরিত করেছিলেন। পরিণামে কবি আহত ও অপমানিত বোধ করেন এবং বাসর ঘর

www.nagorikpathagar.org

হতে কুমিল্লার পথে চলে যান। কমরেড মোজাফ্ফর আহমদ ও এমন একটি মন্তব্য করেছেন, যা এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'যেভাবে কবিকে অপমান ও অসম্মান করা হয়েছিল, তা যে কারই আত্মহত্যার যোগ্য'।

আঁচ অনুমান সত্য হতেও পারে। বাসর ঘরে সে রাতে বিরাজ সুন্দরী দেবীদের কুপরামর্শে হোক আর কবির আত্মঅহমে আঘাত লাগার জন্যই হোক কবি তার নববধূ নার্গিসকে ফেলে গিয়েছিলেন। আর দৌলতপুরমুখী হন নাই। সম্পর্কের ছেঁড়া তার জোড়াও লাগান নাই। বিষয়টা কি লঘু পাপে গুরুশাস্তি হলো না? এটা নার্গিসের নিয়তি, না কবির খেয়ালিপনা। প্রশ্নটা এভাবে আসত না, যদি না মেহেদীর রং না শুকাতেই দেবীদের দেউলে ম্লেচ্ছ, যবন, ঝাড়ু ঝাঁটা মার্কা শেল হজম করে কবি পড়ে থাকতেন। আত্মঅহম, ম্যানলিনেস, কনসাস, শিরীষ ফুলের মতো কবি হৃদয়ের গর্ব চোখে পড়ে না এখানে।

জয়মাল্য কার

ভূ-কম্পনের কারণ আঘাত। অগ্নিগিরির বাষ্পরুদ্ধ লাভা উদ্গিরণের কারণ আঘাত। মেঘমালার বৃষ্টি বর্ষণের কারণ আঘাত। কবি বধূর নিদারুণ আঘাতই তার কবিসত্তার উৎস মুখ খুলে যাওয়ার একমাত্র কারণ। প্রিয়ার বজ্রাঘাত কবির বিজয় ও বিদ্রোহের বজ্র নিনাদ ঘোষণার স্পর্ধা জুগিয়েছে।

কবি ও শিল্পীর মনন ও রুচির পরিচয় বহন তার সৃষ্টি ও শিল্প তার বেদনার গভীরতা, স্বরূপ ও পরিধির পরিমাপ করা যায় তার সৃষ্টির মধ্যে। তার প্রকাশ ভঙ্গিমার মধ্যে। কবি নজরুলের প্রেম, বেদনা ও বৈদগ্ধতা উপলব্ধির সীমা নির্ধারণ করা যায় প্রকাশের গভীরতায়। তার প্রকাশের মধ্যে আগুনের পরশ লক্ষ্য করা যায়। সে পরশ তার বধূ প্রিয়ার প্রেমাগুণের পরশ। এ পরশ তাকে শক্তি স্পর্ধা জুগিয়েছিল, যা কবিকে মহাবিদ্রোহের প্রেরণা ও সাহস দান করিয়েছিল। পুরোটাই প্রিয়ার।

একপত্রে কবি তা স্বীকার করেছেন– 'তুই এ আগুনের পরশ না দিলে আমি অগ্নিবীণা বাজাতে পারতুম না। ধূমকেতুর বিজয় নিয়েও আকাশে উদিত হতে পারতুম না'। প্রিয়ার প্রেম বেদনা কবির বিজয়ের মূল উৎস।

প্রেমাগুন কখন প্রেমে পোড়াজনকে পুঁতি গন্ধময় আবর্জনায় নিক্ষেপ করে। আবার কখন কল্যাণকর শৈল্পিক সৃষ্টি মুখর করে তোলে। প্রেমিকজন তার হৃদয় চিতায় পুড়ে পুড়ে বৈদগ্ধতা লাভ করে। এ বৈদগ্ধতা প্রকাশ প্রবণ অনুভূতি প্রখর করে তোলে।

আগুন জ্বালাতে আগুন আবশ্যক। কবির বাহুতে প্রিয়া বজ্রাগুন জুগিয়েছিলেন। এ বজ্রাগুন কবিকে বজ্রনিনাদে বিদ্রোহ ঘোষণার স্পর্ধা দান করেছিল। তাই তিনি বিদ্রোহী কবি। কবিও তার প্রেম ও প্রিয়াকে প্রকাশের

www.nagorikpathagar.org

সীমানায় মহিমান্বিত করেছেন। কবি এখানে গর্বিত ও অহঙ্কৃত। বেদনাকে নিঃশেষে হজম করে কবি নীলকণ্ঠ। উদ্‌গিরণ করেছেন অমৃত সুধা। বিষহর নীলকণ্ঠ কবি হৃদয়ের রক্তাসনে তার প্রিয়াকে অধিষ্ঠিত করে অর্ঘ্য দিয়েছেন রক্ত রসে প্রস্ফুটিত রক্ত কমল। কবি প্রিয়ার পরিচিতি দিয়েছেন কখনো মিথ্যাময়ী, ছলনাময়ী, কপটচারিণী, মায়াবিণী, পূজারিণী, প্রতারিণী, তাপসশুদ্ধা, দেববালা, চিরমৌনা, শাপভ্রষ্টা, ছলনাময়ী, দেবী প্রভৃতি নামে। আবার নিজের পরিচয় দিয়েছেন প্রেম বিদ্রোহী, পূজারী, ভিখারী, ক্ষ্যাপা, দূর্বাশা, তূর্য্যবাদক, সৈনিক, ভগবানের সৈনিক হিসেবে। বড় বিচিত্র কবির নাম রূপায়ন।

ধরার ধূলিতে প্রেমের অমর প্রতীক তাজমহল। তারও চেয়ে অত্যুজ্জ্বল কবির প্রেম প্রকাশের অবিনাশী প্রেম কাব্য। কালের কপোল তরে সমোজ্জ্বল তাজমহল হয়ত একদিন হারিয়ে যাবে মহাকালের সীমানায়। হয়ত একদিন মলিন হবে তাজমহলের জৌলুস ও মর্যাদা। কিন্তু কবির রক্ত আখারে রচিত এ বেদনা বিধুর মহাকাব্য হারিয়ে যাবে না কোনোদিন। বরং এ কাব্য বিস্তৃত হতেই থাকবে হৃদয় থেকে হৃদয়ান্তরে কাল থেকে কালান্তরে। কবিও সে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তার বিশ্বাস প্রিয়ার উদ্দেশ্যে তিনি যে কাব্য কবিতা, সঙ্গীত ও সুর সৃষ্টি করে গেছেন, তা ব্যাপ্তি লাভ করবে কণ্ঠ হতে কণ্ঠান্তরে হৃদয় হতে হৃদয়ান্তরে, কাল হতে কালান্তরে। তারপর এ বাণী এ সুর নিখিল কণ্ঠে সরব হবে প্রতিদিন, প্রতি সকালে ও সাঁঝে। কবির আশাবাদ ব্যর্থ হয় নাই। দেশে ও বিদেশে আজ কবির বাণী ও সুর সমানভাবে চর্চিত হচ্ছে। কবির আশাবাদ–

তোমারে চাহিয়া রচিনু যে গান
কণ্ঠে, কণ্ঠে হইবে সরব নিখিল কণ্ঠ মাঝে
শুনিবে আমারি সেই ক্রন্দন
সে গান প্রভাতে ও সাঁঝে।
(আড়াল)

কবির কবিসত্তা লুক্কায়িত ও সুপ্তি মগ্ন ছিল। হঠাৎ প্রিয়ার প্রচণ্ড আঘাতে কবির কবিসত্তা বা কবি প্রতিভার প্রকাশ ঘটলো। শতধারায় বিচ্ছুরিত হলো কবির বিক্ষুব্ধ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। অনিবার্য হলো কবির বিজয় ও বিদ্রোহ। কবির হৃদয়ে বসে প্রিয়া বাহুতে শক্তি ও সাহস যোগাল। কবির অসিতে বাঁশি বাজাতে স্পর্ধা যোগালো। তাইতো কবির বিজয় মুকুট লাভ সম্ভব হয়েছিল। কবির এ বিজয় অর্জন সম্ভব হয়েছিল প্রিয়ার জন্য। কাজেই এ জয়মাল্য প্রিয়ার। স্বয়ং কবি সে স্বীকৃতি দিয়েছেন এভাবে–

www.nagorikpathagar.org

আমার আমি লুকিয়েছিলাম তোমার ভালোবাসায়
আমার আশা বেরিয়ে এলো তোমার হঠাৎ আসায়
তুমি আমার মাঝে বসি
অসিতে মোর বাজাও বাঁশি
আমার পূজার যা আয়োজন
তোমার প্রাণের হবি
আমার বাণীর জয়মাল্য, রানী তোমার সবি
(কবিবাণী)

এক মহামহিম আসনে কবি। তার সম্মান, সাফল্য, বিদ্রোহ ও বিজয় অর্জনে প্রিয়া কবির পয়মন্ত ও আশীর্বাদ। কবি নিজে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন এভাবে–

তুমি মোর জয়লক্ষ্মী
আমি তব কবি।
(পূজারিণী)

তুমি কি আসিবে না

বাসরে ঘুমিয়ে রেখে কবি পলাতক। সেই কত দিনের কথা। সেই হতে আজও কবি ফিরেন নাই। কবিকে দৌলতপুরে, নার্গিস নীড়ে ফিরে আনার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। সবাই ধরে নিল কবি দৌলতপুরে আর আসবেন না। শুধু প্রিয়ার হৃদয় বলছে তার কবি ফিরে আসবেন। সেই পথ চেয়ে থাকেন প্রিয়া আশায় আশায়। কবির গানের সুর বাঁধেন। আশ্চর্য হয়ে ভাবেন প্রিয়া। কবি যেন বুকের কথাগুলো তার এমন সুন্দরভাবে সাজায়ে গুজায়ে তুলে ধরেছেন যেন কবির সাথে তার নিয়ত কথা হয়, দেখা হয় না। তার সহিত কথা হয়, তাকে ধরা যায় না। কবি যেন দূর বনের পাখি। তার গান শোনা যায়, যায় না তারে ধরা। কবি যেন পথিক হাওয়া। ফুল ফুটিয়ে ঝরিয়ে ঝরিয়ে যাওয়াই তার স্বভাব। কবির বিরহে কাতর প্রিয়া। কবির রচিত সঙ্গীতেই কবির নিকট অভিযোগ তোলেন। অশ্রুভেজা চোখে আর্দ-আপস্নুত কণ্ঠে প্রিয়া গুণগুণিয়ে উঠেন–

পালিয়ে তুমি বেড়াবে কি
এমনিভাবে
এমনি করে জনম কি মোর
কেঁদেই যাবে।

www.nagorikpathagar.org

ওগো চপল বনের পাখি
ধরা তুমি দেবে না কি
অন্তরালে থাকি শুধু
গান শোনাবে।
কেন এলে নিঠুর তুমি
পথিক হাওয়া
তোমার স্বভাব ফুল ফুটিয়ে
ঝরিয়ে যাওয়া
হে বিরহি লীলা চতুর
অশ্রু কি মোর এতই মধুর
কবে এসে আমার
অভিমান ভাঙাবে।

প্রতীক্ষা ক্লান্ত প্রিয়ার হৃদয়ে সন্দেহ জাগে। তবে কি আর কবি ফিরে আসবে না। তবে কি কবি অন্যকোথাও। অন্য কারো মনে বাসা বেঁধেছেন? সন্দেহ ও শঙ্কায় দোলে প্রিয়ার অবুঝ মন। অভিমান ক্ষুব্ধ প্রিয়া ভাবেন কবি তো তার লেখার মধ্যেও আসার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। তবে কি কবি আর আসবেন না। কবির লেখা দিয়েই কবির নিকট প্রিয়া অভিযোগ তোলেন–

তুমি কি আসিবে না
বলেছিলে তুমি আসিবে আবার ফুটিবে তবে হেনা।
সে দিন ঘুমায়ে ছিল যে মুকুল
আজি সে পূর্ণ বিকশিত ফুল
সে দিনের ভীরু অচেনা হৃদয়
আজ হতে চায় চেনা।
ঘন পল্লব গুণ্ঠন ঢাকা
ছিল সেদিন যে লতা
আজি সে পুষ্প নিবেদন লয়ে
কহিতে চায় যে কথা
প্রদীপ জ্বালায়ে আজি সন্ধ্যায়
পথ চেয়ে আছি তোমার আশায়
পূর্ণিমা তিথি আসিল হে চাঁদ
অতিথি আসিলে না।

www.nagorikpathagar.org

প্রতীক্ষার প্রান্তে উপনীত প্রিয়া। কবির ফিরে আসা আজ দূরাশা মাত্র এ পথ চাওয়া, এ নিশিজাগা অর্থহীন। আশা ছিল এ প্রেমের তরী তীরে ভিড়বে কামনাগুলো পূর্ণতা পেয়ে পুষ্পে মুকুলিত হবে। জীবনের কামনাগুলো পরিপূর্ণ হবে। এত কিছুর পরও প্রিয়ার কবি প্রতীক্ষার শেষ হয় না। অতৃপ্তির হতাশা প্রিয়াকে নিরুৎসাহিত করতে পারে না। কবি প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকেন প্রিয়া। হয়ত এমনি করে জনম ভরে কবির প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকবেন অনন্তকাল–

হয়তো আমার বৃথা আশা
তুমি ফিরে আসবে না
আশায় তরী ডুববে কূলে
দুঃখের স্রোতে ভাসবে না।
হয়ত তুমি এমনি করে
পথ চাওয়াবে জনম ভরে
রইবে দূরে চির তরে
সামনে এসে হাসবে না।
কামনা মোর রইল মনে
রূপ ধরে তা উঠল না
বারে বারে ঝরল মুকুল
ফুল হয়ে তা ফুটল না।
অবুঝ এ প্রাণ তবু কেন
তোমার ধ্যানে বিভোর হেন
তুমি চির চপল নিঠুর
জানি ভালোবাসবে না।

শাপভ্রষ্টা প্রিয়া। কবির প্রেমে নিঃশেষে নিবেদিতা বিরহ আগুনে পুড়ে পুড়ে প্রিয়ার কাল কাটে। আলু-থালু মলিন বেশ। আঁখিতে বেদনা বিদগ্ধ অশ্রুধারা। বিরহিণীর বিরহের শেষ নাই। আর কত কাল কবি এমন করে পথ চাওয়াবে? এ পথ চাওয়ার যেন শেষ নাই। প্রিয়া ভাবেন, কবিকে পাওয়ার আগেই বুঝি তার আঁখি দ্বীপ নিভে যাবে। হয়ত কবির সহিত তার দর্শন লাভ হবে না। কবিকে চাহিয়া প্রিয়ার কত আঁখি তারা নিভে গেছে। সেই আঁখি তারা নীড়হারা পাখির মতো আকাশে জেগে আছে। কবির জন্য কবির বিরহে প্রিয়া কত অশ্রু ফেলেছেন। সেই অশ্রু আর আঁখি তারা কবির পদতলে লুটাতে চায়। প্রিয়া জানতে চান, বিরহের আর কতকাল বাকি আছে। ততদিনে বেঁচে থাকবে তো তিনি–

www.nagorikpathagar.org

আরো কতদিন বাকি
তোমারে পাওয়ার আগে বুঝি হায়
নিভে যায় যায় মোর আঁখি।
কত আঁখি তারা নিভিয়া গিয়েছে
কাঁদিয়া তোমার লাগি
সেই আঁখিগুলো তারা হয়ে আজও
আকাশে রয়েছে জাগি
যেন নীড়হারা পাখি।
কত লোকে আমি তোমার বিরহে
ফেলেছি অশ্রু জল।
ফুল হয়ে সেই অশ্রু ছুঁইতে
চাহে তব পদতল।
সে সাধ মিটিবে নাকি।

প্রথম বাসরে পালিয়ে গেছে লীলা চতুর। একটিবারের জন্যও আসেননি দৌলতপুরে, প্রিয়ার সান্নিধ্যে। কবি যেন দূর বনের পাখি। প্রিয়াকে নিত্য নতুন গান শোনায়। কবির লেখার প্রায় সবটাজুড়ে থাকেন প্রিয়া। প্রিয়াই তো কবির লেখার মধ্যমণি। কবির রচিত কবিতা ও সঙ্গীতে কবি নিজের কথা বলেন, প্রিয়ার কথাও বলেন। তাতে প্রিয়ার দর্শনের দরকার হয় না। কথোপকথন চলে এন্তার। তাতেই প্রিয়া ধন্যা, বরেণ্যা। তাতেই প্রিয়া পূর্ণা ও নিমগ্না।

কবির বিরহে পুড়ে পুড়ে প্রিয়া বৈদগ্ধতা অর্জন করেছেন। এমন মিলন প্রিয়া আর প্রত্যাশা করে না। ধরণীর প্রেম সে তো ক্ষণস্থায়ী। অনন্ত প্রেমের রাজ্যে প্রিয়া কবিকে নিবিড় করে পেতে চান। সে রাজ্যেই হবে অনন্ত মিলন। ইহ জগতে কবি যেখানে থাকুক। চাঁদের চেয়ে চাঁদের আলো প্রিয়ার ভালো।

চাঁদের যেমন চকোরি, সূর্যের যেমন সূর্যমুখী কবির তেমনি প্রিয়া। কবি দূর থেকে ভালোবাসবেন। কাছে পেতে চাইবেন না। কবি প্রিয়ার আরাধ্যা। প্রিয়া কবির আরাধিকা। জনমে জনমে কবির জন্য প্রিয়া কাঁদবেন। কবি যতই আঘাত হানুক প্রিয়া ততই ফিরে ফিরে কবির চরণ সাধবেন। লোকে লোকে কবির সাথে হবে প্রিয়ার অনন্ত অভিসার–

জনম জনম তব তরে কাঁদিব
যতই হানিবে হেলা তত সাধিব।
তোমারি নাম গাহি
তোমারি প্রেম চাহি

www.nagorikpathagar.org

ফিরে ফিরে নীতি তব চরণে আসিব।
জানি জানি বধূ চাহে যে তোমারে
ভাসে সে চিরদিন নিরাশা পাথারে
তবু জানি হে স্বামী
কোন সে লোকে আমি
তোমারে পাব বুকে বাহুতে বাঁধিব।

কবি এমনি করে পথ চাওয়াবে যুগে-যুগে, কালে-কালে, লোকে-লোকে। কবির জন্য প্রিয়া একজনম কেন, শত জনম প্রতীক্ষার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বিরহের চিতায় পুড়ে পুড়ে প্রিয়া অনাদী প্রেমের সন্ধান লাভ করেন। উত্তরণের সাধনায়রত প্রিয়া এখন।

ভুলি কেমনে আজও যে মনে

কবির নিজের ভাষায়, স্ব-জ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় কবি প্রিয়ার সহিত পরিণয়ে আবদ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তার ধারণা জন্মে যে তার বধূ প্রিয়া এক মিথ্যাময়ী। মিথ্যাময়ীর তাড়নায় দিশেহারা কবি নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছিলেন। পথহারা ও স্বরবেঁধা পাখির ন্যায় নিরুদ্দেশ ঠিকানার তল্লাশে সহসা কার শান্ত মেদুর হাতছানি পেয়েছিলেন। কবির পার্থ পথ রথ বাধা পেয়ে আশ্রয় নিল বিজয়িনী প্রমীলার দ্বারপ্রান্তে। রক্তমাখা আহত কবিকে তিনি তার বক্ষপুটে একান্ত শান্তি নীড়ে টেনে নিয়েছিলেন। এমন সুখের নীড়ে কবি তো সুখে থাকার কথা।

কিন্তু না। কবির অনন্ত অগন্তা তৃষ্ণাকূল বিশ্বমাগা প্রেম তৃষ্ণা এখানেও নিবৃত্ত হলো না। কবির প্রেম তৃষ্ণা ছিল অনাদী অপার। এক সিন্ধু শুষে বিন্দু সম, যাচে সিন্ধু আর। এমনি প্রচণ্ড প্রেম তৃষ্ণা কবির। কবি খুঁজছিলেন–

'কোথা মোর তৃষ্ণা হরা প্রেম সিন্ধু অনাদী অপার'।
প্রেমসিন্ধুর পরিচয় দিয়েছেন কবি এভাবে–
'মোর চেয়েও স্বেচ্ছাচারী দুরন্ত দুর্বার। কোথা গেলে তারে পাই'।

কবির চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে সৃষ্টি হলো ব্যবধানের সুউচ্চ দেয়াল। কবির প্রাপ্তির পূর্ণতা মিলে নাই। না পাওয়ার অতৃপ্ত কবি দ্বার থেকে দ্বারে তার অন্তরের যৌবন জ্বালা জাগা অতৃপ্ত বিধাতাকে চেপে নিয়ে ভিক্ষা মাগি ফিরছিলেন। অতৃপ্ত কবি এক বুক তৃষ্ণা নিয়ে পথে পথে ঘুরছেন। সহসা কবির মনে পড়ে, যার জন্য পথে পথে ঘুরা সেই তৃষ্ণা হরা প্রেমসিন্ধুর সাক্ষাত হয়েছিল কবির। কবির ভাষায়–

www.nagorikpathagar.org

দুদিন না যেতে যেতে এ কি সেই পুণ্য গোমতীর কূলে
প্রথম উঠিল কাঁদি অপরূপ ব্যথা গন্ধ নাভি পদ্মমূলে।

(পূজারিণী)

বোধোদয় ঘটে কবির। তার তৃষ্ণাহরা প্রেমসিন্ধুর তো সাক্ষাত ঘটেছিল কবির গোমতীর কূলের কিশোরী বধূ প্রিয়া, যাকে কবি পেয়েও হারিয়ে এসেছেন। ক্ষ্যাপার মতন কখন যে তার পরশ পাথর ভাগ্যে মিলেছিল আর কখন যে পাথরান্যে ছুড়ে ফেলে রিক্ত হয়ে আছেন কবি নিজেই জানেন না। যাকে পেলে কবি পূর্ণ হতেন আর তার অনাদী প্রেম তৃষ্ণার পরিসমাপ্তী হতো, যা কবির ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে–

'তোমায় পেলে থামতো বাঁশি'
(পূজারিণী)

অনাদৃতা বধূ প্রিয়ার প্রেমেই কবির পূর্ণতা ও প্রশান্তি। যাকে বাসরে হারায়ে খুঁজে ফিরছেন কবি চির বিরহে। সেই অপ্রাপ্যনিয়া না পাওয়ার বেদনায় কবির কবিতা, সুর ও সঙ্গীতের একমাত্র উৎস ও প্রেরণা।

কবি কি ভুলতে পেরেছিলেন তার প্রথম প্রিয়াকে। সেই গোমতীর কূলের পাতার কুঠিরে আবিষ্ঠা তার কিশোরী বধূকে। পারবেন যদি, তবে কেন এত বিরহ কাতর যন্ত্রণা দগ্ধ আকুলতা? তবে কেন এত আঁখি জল? কেন প্রেম দগ্ধ বেদনা কাব্য সৃজনের অস্থিরতা? না, কবি ভুলতে পারেন নাই সেই গ্রাম্য বালিকাকে। সেই মেঘনা মতির কন্যাকে। কবি তার উত্তর দিয়েছেন–

ভুলি কেমনে আজও যেমনে বেদনা মনে রহিল আঁকা
আজও সজনী দিন রজনী সে বিনে গুনি তেমনি ফাঁকা।
(বুলবুল)

ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেন কবি। কিন্তু বার বার পরাজয় নেমে আসে। সহস্র বার চেষ্টা করেও কবি তার মানস বধূকে এক মুহূর্তের জন্যও স্মরণের আড়াল করতে পারেন না। প্রতিনিয়ত বধূ প্রিয়ার টলটল আঁখি ও মিনতি কাতর চোখ কবির হৃদয় অলিন্দে উঁকি দেয়। বড় বিষাদ করুণ সে চাহনী। ভুলবার প্রাণান্ত চেষ্টার পরও ফিরে দেখেন তার বধূ প্রিয়া ঠিক যেমনটি দাঁড়িয়ে ছিলেন তেমনটি দাঁড়িয়ে আছেন। একটুও নড়েচড়ে সরে যান নাই। ভিখারিণীর মিনতি মাখা সে আহ্বান কবি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না।

www.nagorikpathagar.org

কবি কায়া আর সেই কিশোরী কবির স্মৃতিছায়া দশদিকে ভাসে। যেদিক তাকান সেদিকেই কবি তার স্মৃতিছায়া দেখতে পান। কবির পোড়া ছায়া জগৎজুড়ে রোদন ভরা মাতম তোলেন। কবি ভুলবেন কি করে। কবির ভাষায়–

তখন মোদের কিশোর বয়স, যেদিন টুট্‌ল বাঁধন
সেই হতে কার বিদায় বেণুর জগৎজুড়ে শুনছি রোদন
সেই কিশোরীর হারা মায়া
ভুবন ভরে নিল কায়া
দোলে আজও তারি ছায়া আমার সকল পথে আসি।
(অকরুণ প্রিয়া)

প্রিয়ার প্রেমদগ্ধ স্মৃতি কবিকে কাঁদায়। অশ্রু জলে ভরে উঠে কবির দুনয়ন। প্রিয়ার এ ব্যথার ভার কবি বহিতে পারেন না, সহিতে পারেন না; ফেলতেও পারেন না। আবার বুকে তুলে নিতেও সংস্কারে বাঁধে। এ যেন কমলে কাঁটা। কবির অচ্ছেদ্য জীবন সঙ্গী, বেদনা আর মাধুরীতে মাখা টক-ঝাল-মিষ্টি। দুঃসহ দর্শন জ্বালায় কবি চোখ মোছেন। আবার সে চোখে বন্যা জাগে। তেমনি প্রিয়ার স্মৃতি কবি ভুলতে পারেন না। কবির ভাষায়–

চোখ মুছিলে জল মোছে না
বল সখী এ কোন জ্বালা

কবি বার বার ফিরে তর্পণ ভূমিতে চলে আসেন। যেখানে প্রিয়ার স্মৃতি তপন করেন। জাবর কাটেন। প্রিয়ার বিচ্ছেদ বিষে নীলকণ্ঠ কবি উদ্‌গিরণ করেন বিরহ্ কাতর যন্ত্রণা বিধৃত বাণী–

ভুলিতে পারিনি তাই
আসিয়াছি পথ ভুলে।

কবির হৃদয় বাতায়নে উঁকি দেয় দৌলতপুর; সেই হৃদয় হরা দিনগুলো। সেই খাঁ বাড়ির নিতল শীতল দীঘি, সেই আম গাছ, গাব গাছ আর কামরাঙ্গা গাছ, অদূরের ধর্ম সাগর, সেই কিশোরীর মেঘবরণ কন্যার চপল প্রেম, প্রণয় ও পরিণয়। সেই বেতকাষ্ঠের বাসর। সেই কিশোরীর ভরাট দেহ বার বার কবির হৃদয় নাচন তোলে সেই আড়াই মাস। কবি ভুলবেন কি করে?

www.nagorikpathagar.org

ঘুরে ফিরে কবিকে অস্থির উন্মন করে তোলে। মৃগীর নাভী মূলের গন্ধে বারবার উতলা হয়ে উঠেন কবি। চঞ্চল মৃগের মতো উৎকর্ণ হয়ে উঠেন তিনি। কবি হেলায় যাকে ফেলে এসেছেন, দুদিন না যেতেই তার প্রতি অনুরাগ অনুভব করেন কবি। প্রিয়াকে ভুলে যাবার অঙ্গীকার আলগা হয়ে যায়, কবি ভুলে যাবেন কেমন করে–

তব চেনা কণ্ঠে মম কণ্ঠ সুর,
রেখে আমি চলে এনু কবে কোন পল্লী পথে দূর।
দুদিন না যেতে একি সেই পুণ্য গোমতীর কূলে
প্রথম উঠিল কাঁদি অপরূপ ব্যথাগন্ধ নাভীপদ্মমূলে।

(পূজারিণী)

কায়া নিয়ে পালিয়ে এসেছেন কবি। কবির দৌলতপুরের স্মৃতি ছায়া হয়ে চলে এসেছে তারি সাথে। ছায়া তাড়াবার উপায় নাই তার যে পায়ে প্রিয়াকে দলে এসেছেন, সেই অভিমান তার চূর্ণ-বিচূর্ণ। দুচোখ ছাপানো জলে ব্যাকুল কবি তার হারানো স্মৃতি তপন করেন–

তরুণ তাহার ভরাট বুকের উপচে পড়া আদর সোহাগ
হেলায় দুপায় দলেছি মা, আজ কেন হায় তার অনুরাগ
এ চরণ সে বক্ষে চেপে
চুমেছে আর দুচোখে ছেপে
জল ঝরেছে, তখনও মা, কইনি কথা অহঙ্কারে।

(অবেলার ডাক)

কবি ও প্রিয়ার মাঝে আজ বিরহ বাতাস বহমান। মিলনের মাঝে বাধার বিন্ধ্যাচল। কবি যাদের নিষ্ঠুর ব্যাধ বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, তারাও সক্রিয়। হাত বাড়ালে যাকে পেতেন অনায়াসে সেই হাত বাড়াতে পারেন না কবি। সেই প্রাচীর সামনে দাঁড়ায়। অসহায়ে কবি ব্যর্থতার গস্নানির দহনে বিদগ্ধ। কবি অনুভব করেন, তার প্রিয়াও বোধকরি তারি মতো বিরহ কাতরা। এ জগত ক্ষণস্থায়ী। পর জগত অনন্ত। তিনি প্রিয়াকে এ জগতে ভুলে যেতে পরামর্শ দিয়ে পর জগতে পাওয়ার ইশারা করেন এভাবে–

www.nagorikpathagar.org

পর জনমে দেখা হবে প্রিয়
ভুলিও হেথায় মোরে ভুলিও
এ জনমে যাহা বলা হলো না
আমি বলিব না তুমিও বলো না
জানাইলে প্রেম করিও ছলনা
যদি আসি ফিরে বেদনা দিও
হৃদয়ে যেথায় প্রেম না শুকায়
সেই অমরায় মোরে স্মরিও
(চোখের চাতক)

হারানো অতীত সর্বহারার মধ্যে এক সময় হারিয়ে যায়। জ্বলে যাওয়া বুকের তলায় ধিকি ধিকি জ্বলে শুধু চিতাগ্নি। দগ্ধ বুকের ক্ষত কি সহজে ভোলা যায়? ভুলতে পারেন না কবিও। হৃদয়ের রক্তে কাব্য কবিতা, সঙ্গীত ও সুর সাধেন তিনি আলোর তিয়াসী কবি চন্দ্রালোকের প্রতীক্ষায় কৃষ্ণপক্ষের রাত কাটান। প্রথম প্রেম কেউ কি ভুলে যেতে পারেন? যিনি পারেন তিনি আর যাই হোক, প্রেমিক নন। কবি নিজের অজান্তে গেয়ে উঠেন–

কেউ ভুলে না, কেউ ভুলে
অতীত দিনের স্মৃতি
কেউ দুঃখ লয়ে কাঁদে
কেউ ভুলিতে গায় গীতি।
(চোখের চাতক)

চোখ মুছিলে চোখের জলের শেষ হয় না। অন্তঃস্রোতের প্রস্বরণে আবার চোখ ভরে উঠে। কমলের সাথে সাথে কমলের কাঁটাও যাওয়া উচিত। কিন্তু একি চোখ মুছিলে যেমন চোখের জল মোছে না, তেমনি কমল গেলেও কমলের কাঁটা যায় না কেন? নিরুপায় কবি সে সত্য প্রকাশ করেছেন এভাবে–

কাঁটা আমার যায় না কেন কমল গেলো যদি
সিনান বধূর শাপ শুধু আজ কুড়াই নিরবধি।

এক অতলান্তক বিরহ সাগরে কবি নিমজ্জিত। প্রিয়াকে ভুলতে না পারার অব্যক্ত গোঙানি আর্তনাদের মতো ঝরে পড়ে কবি কণ্ঠে–

www.nagorikpathagar.org

তুমি ভুলে থাকো মোরে ভুলিতে দিও না
মোর সব কেড়ে নাও তব স্মৃতি কেড়ে নিও না।
শুধু কাঁদিতে দাও প্রিয় তব বিরহে
আমি তোমারে পাব না সকলে কহে
তবু প্রেমদ্বীপ মোর জ্বলিতে দাও
তারে নিভিয়ে দিও না।

কবির জীবনের খেরোখাতার পাতায় পাতায় অসংখ্য ভুল ছিল। যখন ভুল ভাঙলো ততদিনে গোমতীর জল অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। যন্ত্রণাকাতর বুকভাসা হাহাকারই কবির সঙ্গী। মুহূর্তের জন্য তিনি ভুলে থাকতে পারেন না। সেই কিশোরীর প্রেমের স্মৃতি। বেদনা সুনীল সেই সত্য উপলব্ধির প্রকাশ ঘটিয়েছেন এভাবেই–

রহি রহি কেন আজ সেই মুখ মনে পড়ে
ভুলিতে তাই চাহি যত তত স্মৃতি কেঁদে মরে।

কবির চির জনমের হারিয়ে যাওয়া গৃহলক্ষ্মী, অশ্রুমতি, চিরশুদ্ধা তাপস কুমারী প্রিয়া। এ পয়মন্ত প্রিয়ার পরশে কবি অগ্নিবীণা বাজাতে পেরেছিলেন। মহা বিদ্রোহী তুর্য্যবাদক হতে পেরেছিলেন। সেই হারামণি কবির বিজয়ের মধ্যমণি। কবি কি তাকে ভুলে যেতে পারেন? কবি সেই হারামণিকে গানের প্রদীপ জ্বালিয়ে খোঁজে ফিরেন–

পেয়ে আমি হারিয়েছি গো
আমার বুকের হারামণি
গানের প্রদীপ জ্বেলে তারেই
খুঁজে ফিরি দিন রজনী
সে ছিল গো মধ্যমণি
আমার মনের মণি কোঠায়
রেখেছিলাম লুকিয়ে তাই
মানিক যেমন রাখে ফণী।

কবিও কবি প্রিয়া আজ নেই। তাদের অতৃপ্ত বিদেহী আত্মা হয়তো আজও একে অপরকে খুঁজে ফিরছে। মৃত্যু তাদের অনন্ত আড়াল করে রেখেছে কিন্তু তাদের অমর প্রেম অবিনশ্বর হয়ে আছে, থাকবে অনন্তকাল। এ প্রেম, বেদনার

www.nagorikpathagar.org

মহাকাব্য মানুষের মনে থাকবে অনন্তকাল। মরেও এরা পরস্পরকে খুঁজে ফিরবে। কবি যেমনটি আভাস দিয়ে গেছেন–

প্রাণহীন দেহ আকাশে ফেলিয়া ধরণীতে আমি ফিরি
তোমারে খুঁজিয়া বেড়াই গোমতী পদ্মা মেঘনা তীরে।

ভুলতে না পারার অসহায় গোঙানী উঠেছে তার লেখনিতে–
বহে লো মোর গগনে চাঁদ বিরহীর সাধ করে পাওয়া
যে গেলো ভুলবে বলে আজকে তোর বুক ভরে পাওয়া।

দুই কূলে থাকি কাঁদিব দুজন

প্রেম সত্য, বিরহ সত্য। তার চেয়ে বড় সত্য আঁখিজল। সে সত্যই নিত্য হোক চিরন্তন হোক। সে সত্যের চরম উপলব্ধি ঘটে কবির এ রক্ত লিখায়–

ঘুচিলো না অনন্ত আড়াল
তুমি কাঁদো, আমি কাঁদি, কাঁদে সাথে কাল।
কাঁদে গ্রীস্ম, কাঁদে বর্ষা, বসন্ত ও শীত
নিশিদিন শুনি বন্ধু ঐ তব ক্রন্দনের গীত।
নিখিল বিরহী সিন্ধু তব সাথে
তুমি কাঁদো আমি কাঁদি কাঁদে প্রিয়া রাতে।
এ অশ্রু এ বেদনার আঁখি জল
তব চক্ষে হে বিরহী বন্ধু মোর করে টলমল।
এক জ্বালা এক ব্যথা নিয়া
তুমি কাঁদো, আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া।
(সিন্ধু)

কবি ও প্রিয়ার মাঝে অনন্ত বিরহ পার। দুই কূলে থেকে দুজন কাঁদিবে রাতের চখাচখীর মতোন। কবির লেখায়–

অনন্ত এ বিরহের নাহি পার
হবে না মিলন আর এ জনম
এই বুঝি হায় বিধির লিখন
দুকূলে থাকি কাঁদিব দুজন
রাতের চখাচখী সম।

www.nagorikpathagar.org

অন্যত্র কবি লিখেছেন–
ফিরি ফিরি কেন তারই স্মৃতি
মোরে কাঁদায় নীতি
যে ফিরিবে না আর।
ফিরিয়েছি যায় কাঁদাইয়া হায়
সে কেন কাঁদায় মোরে বার বার।

দোলনের প্রমীলাত্ব লাভ

কবির কারামুক্তির দিন। কবির ভক্ত অনুরক্তরা জেল গেটে সমাগত কিন্তু কবি নাই, কবি কোথায়? খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ। সম্ভাব্য সব অবস্থানে দেখা হলো। কোথাও কবি নাই। কবি মুক্ত হয়েছেন অনেক আগে। তবে গেলেন কোথায় কবি?

অনেক খোঁজাখুজির পর অবশেষে কবিকে পাওয়া গেলো। ৫ নাম্বার হাজী লেনে একেবারে বিয়ের পিঁড়িতে। চানাচুর-এর লেখিকা মিসেস এফ রহমান স্বীয় তত্ত্বাবধানে কুমিল্লা থেকে গিরিবালা সেনগুপ্তাকে তার স্বজনদের শত বাধা উপেক্ষা করে কন্যা দোলনকে (আসল নাম আশালতা) নিয়ে উঠেছেন সেখানে। এ বাড়িতেই দোলনের সহিত কবির বিয়ে। তারিখ ছিল ২৫ শে এপ্রিল, ১৯২৪। সওগাত সম্পাদক নাসির উদ্দীনসহ অল্প কয়েকজন এ বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন।

এখানে ঘটলো একটা বিভ্রাট। প্রশ্ন দেখা দিল কোন ধর্ম মতে বিয়ে হবে। হিন্দু না মুসলিম রীতি। গিরিবালার দাবি মতে হিন্দু রীতিতে? কিন্তু বেঁকে বসলেন কবি। তার দাবি আমার দেহে মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত, অতএব মুসলমান রীতিতেই বিয়ে হবে।

অবশেষে ক'জন আলেমের শরণাপন্ন হতে হলো। তাদের পরামর্শে কনে পক্ষকে আহলে কেতাব ধরে নিয়ে বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। বিয়ের পর কবি দোলনের নতুন নাম দিয়েছিলেন প্রমীলা। এ নামেই তিনি পরবর্তীতে পরিচিত ছিলেন।

এ বিয়ের মাধ্যমে কবির বিদ্রোহী রক্ত আঁখি শান্ত হলো। এ বিজয়িনীর দ্বারপ্রান্তে এসে বাধা পেয়েছিল কবির পার্থ-পথ-রথ। অগন্তার অনন্ত তৃষ্ণাকূল পিপাসার্ত হৃদয় যেন মহাসিন্ধুর সন্ধান পেলেন। আত্মসমর্পণ করলেন কবি তারও চেয়ে স্বেচ্ছাচারী বক্ষপুটে। বিদ্রোহী রক্ত রথের চূড়ায় রক্ত লাল পতাকার স্থলে এবার উড়ালেন নীলাম্বরীর অঞ্চলপ্রান্ত। কবির ভাষায়–

www.nagorikpathagar.org

হে মোর রানী, তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে
আমার বিজয় কেতন লুটায় তোমার চরণ তলে এসে।
আমার সমর জয়ী অমর তরবারি
দিনে দিনে ক্লান্ত আমি হয়ে উঠি ভারি।
এখন এ ভার আমার- তোমায় দিয়ে হারি
এ হার মানা হার- পরাই তোমার গলে।

ওদিকে দৌলতপুরে নার্গিস নীড়ে কবিকে ফিরে আনবার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। হতাশায় ভেঙে পড়েন সকলে। তখনো প্রিয়ার প্রতীক্ষার অবসান হয় নাই। চোখের জলে পথ চেয়ে থাকেন প্রিয়া। তার বিশ্বাস তার কবি ফিরে আসবেন একদিন। কবিই সে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন–

সেই সে বিদায় ক্ষণে
শপথ করিলে বন্ধু আমার রাখিবে আমায় মনে
ফিরিয়া আসিবে খেলিবে আবার সেই পুরাতন খেলা।

কবির এ শপথ, এ অঙ্গীকার বুকে নিয়ে কাটে প্রিয়ার দিন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রান্তে প্রিয়ার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। প্রিয়া ভাবেন তার কবি হয়তো, কোনোখানে অন্যকোথাও বাসা বেঁধেছেন, অন্য কারো সঙ্গে পুরাতন সেই খেলায় লিপ্ত হয়েছেন–

সে মোরে ভুলে নাচে কাহার সনে
বুঝি সই বধূ মোর কেন লাজে মরে
সে যে জানতো না সজনী
কভু আমা বই।

সরলা বিভোলা পল্লীবালার সহিত কবির এ আচরণ বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছিল। তবুও নিয়তির নির্মম পরিহাস অনিবার্য রূপ নিয়েছিল তার জীবনে।

তবু তোমাকে দিব না ভুলিতে

প্রথম প্রেম আর প্রথম প্রিয়াকে কেউ কি ভুলতে পারে? ভুলতে পারেন নাই কবিও। কবির ক্ষণিকের বধূ প্রিয়া নানা রঙ্গে, নানা রূপে অপরূপ হয়ে কবির সম্মুখে বর্তমান। দুহাতে চোখ ঢাকলেও মনের চোখে প্রিয়া প্রতিভাত হয়ে উঠেন নতুন রূপে। চোখ মুছিলেই যেমন চোখের জল মোছে না, তেমনি তার

 www.nagorikpathagar.org

প্রিয়াকে কবি তিলেকের জন্য আড়াল করতে পারেন না। তাই কবিও অঙ্গীকার করেন যে, তিনি যেমন প্রিয়াকে ভুলতে পারছেন না, তেমনি প্রিয়াকেও ভুলতে দিবেন না। কিন্তু কেমন করে? সে উপায়ও কবি বাতলে দিয়েছেন তার লেখনিতে–

আমি চিরতরে দূরে চলে যাব
তবু তোমাকে দেব না ভুলিতে।
আমি বাতাস হইয়া জড়াইব কেশ
বেণী যাবে যবে খুলিতে।
তোমার সুরের নেশায় যখন
ঝিমাবে আকাশ কাঁদিবে পবন
রোদন হইয়া আসিব তখন
তোমার বক্ষে দুলিতে।

বাহ্! কি অপূর্ব উপায়। হৃদয়ের গভীরতম কন্দর হতে যে প্রেম, যে বেদনা উৎসরিত, যে ক্রন্দন কবি অষ্টপ্রহর শোনেন, যে হাহাকার, যে অভিশাপ প্রিয়াকেও অষ্টপ্রহর শ্বসন করে, প্রিয়া ভুলবেন কেমন করে?

প্রিয়ার উদ্দেশে কবি গান রচনা করেন, সুর সৃষ্টি করেন। সে গান, সে সুর আকাশে ছাড়িয়ে দেন, তারপর কণ্ঠ হতে কণ্ঠে বিস্তার লাভ করবে। এক সময় নিখিল কণ্ঠেও ভাষা পাবে। প্রিয়ার মর্মমূলেও তা বেদনা ছড়াবে। মর্ম যাতনায় প্রিয়া ভুলতে পারবেন না। কবির ভাষায়–

নিষ্ঠুর আমি, আমি অভিশাপ, ভুলিতে দিব না তাই
নিঃশ্বাস মম তোমারে ঘিরিয়া স্বসিবে সর্বদাই
তোমারে চাহিয়া রচিনু যে গান
কণ্ঠে, কণ্ঠে লভিবে তা প্রাণ
আমার কণ্ঠ হইবে নীরব, নিখিল কণ্ঠ মাঝে
শুনিবে আমার সেই ক্রন্দন, যে গান প্রভাতে ও সাঁঝে।

প্রেম যেন নদী। এক তীরে তার নর, আর অন্য তীরে নারী। অনিমেষ চেয়ে থাকা। এ চাওয়ার শেষ নাই, সমাপ্তি নাই। মাঝখানে তার অসীম বিরহ নদী। প্রেম যেন দূর আকাশের চাঁদ। আঁখি জলে চেয়ে থাকা মানব মানবী। যেন উপবাসী বেদনা কাতর লোলুপতা। এরই নাম প্রেম।

www.nagorikpathagar.org

প্রেম যেন ঝরা ফুল, জন্ম জন্মের অশ্রু হার। প্রেম সত্য, বেদনা সত্য, চিরসত্য আঁখি জল। এ সত্য বুকে নিয়ে কাঁদেন কবি, কাঁদেন কবি প্রিয়া, কাঁদেন বিরহী মানব ও মানবী। সকলে প্রেমিক, সকলে বিরহী, প্রেমবিদ্ধ যন্ত্রণাকাতর।

সৃষ্টির সবখানে একই গান, একই ব্যথা, না পাওয়ার আকুলতা। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, উদ্ভিদ, জঙ্গল সকলে প্রেম মজনুন। সৃষ্টির সর্বত্র প্রেম ও বিরহ সমান্তরাল। প্রিয়হারার কাতরতা সর্বত্র। সৃষ্টির মূল সুরই বেদনা সুনীল হাহাকার। কবিও বিশ্ব প্রকৃতির ব্যতিক্রম নয়। না পাওয়ার অব্যক্ত গোঙানী ভাষা পেয়েছে কবির ভাষায়–

বল বন্ধু বল- জয় বেদনার জয়
যে বিরহে কুলে, কুলে নাহি পরিচয়
কেবল অনন্ত জল অনন্ত বিচ্ছেদ
হৃদয় কেবলি হানে হৃদয়ে নিষেধ
যে বিরহে গ্রহ-তারা শূন্যে নিশিদিন
ঘুরে মরে গ্রহবাসী হয়ে উদাসীন
উল্কা সম ছুটে যায় অসীমে পথে
ছোট নদী দিশাহারা গিরি চূড়া হতে
বন্ধু তার জয় হোক।

কবির সব লেখা প্রেমদগ্ধ যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ের ক্রন্দনগীত। প্রায় সব লেখায় প্রিয়ার প্রতি নিক্ষেপিত, প্রিয়ার ধ্যানে নিবেদিত। অশ্রুময় এ সব পঙ্‌ক্তিমালা একত্রে সন্নিবেশিত হলে একটি বেদনার মহাকাব্য হবে, তাতে সন্দেহ নাই।

'তবু তোমাকে দিব না ভুলিতে' কবির এ অপূর্ব না ভোলার উপায় কাজে লেগেছিল কবি প্রিয়ার। কবি প্রিয়া আমৃত্যু কবিকে ভুলতে পারেন নাই। নিত্য নতুন কবির লেখা তিনি সংগ্রহ করে নিবিষ্ট মনে পড়তেন। গ্রামোফোন রেকর্ড কবির গান তন্ময় হয়ে শুনতেন। তখন তার চোখে অবিরাম জলঝরে পড়তো। এভাবে এ অভিনব উপায়ে কবি তার প্রিয়াকে ভুলে থাকতে দেন নাই আর ভুলতে পারেন নাই নিজেও।

ভিখারী ও পূজারী কবি

ভালোবাসা কবিকে ভিখারী করেছে আর কবি প্রিয়াকে করেছে রানী। এ দাবির যথার্থতা পাওয়া যায় কবির রূপায়নে। কবি তার বাণীর যথার্থ মেজাজ, মাধুর্য ও গাম্ভীর্য দিয়েই সৃষ্টি করেছেন আর তার রানীর বিপরীতে নিজেকে এক দীনহীন ভিখারী রূপে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য এ রানী ও ভিখারী

www.nagorikpathagar.org

বাস্তবে নয়। কবির কল্পনা রাজ্যের ভাবের রাজ্যের।

কবি তার রানীর কাছে জোড় হাতে করুণা প্রার্থনা করে থাকেন। যাচি, মাগি, চাহি, কাঁদি প্রভৃতি শব্দ যোগে রানীর প্রসাদ লাভের আকুতি পেশ করে থাকেন। রানীর রাজ্যে কবি দস্যু তস্কর নহেন। রানীর বিরুদ্ধে কখনো বিদ্রোহ বিক্ষোভ প্রকাশ করেন না। রানীর ধন ভাণ্ডার লুণ্ঠন করেন না। রানীর প্রতি বিনয়াবত কবি।

এ ভেবে অবাক লাগে যে, এ কি সেই কবি যার এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি আর হাতে রণ তুর্য্য। কবি তার রানীকে প্রকাশের সীমানায় মহিমা মণ্ডিত করে গড়ে তুলেছেন। কবি কখনো তাকে খাটো করে দেখেন নাই। প্রকাশের চাতুর্য্য ও মাধুর্য্য সৃষ্টিতে কবি অতুলনীয়। কবির ভাষায়–

ভালোবাসা মোরে ভিখারী করেছে
তোমারে করেছে রানী
তোমার দুয়ারে কুড়াতে এসেছি
ফেলে দেয়া মালাখানি।

অন্যত্র কবি তার রানীকে ভিন্ন আরেক সাজে সাজিয়েছেন। কল্পনাচারী কবি তার রানীকে প্রকৃতির অলঙ্কারে ভূষিত করেছেন। কবির লেখায়–

মোর প্রিয়া হবে এসো রানী
দেবো খোপায় তারার ফুল
কণ্ঠে দোলাব তৃতীয়া তিথির
চৈতী চাঁদের দুল।

অন্য কোথাও কবি তার রানীকে দেবী, দেববালা তাপস শুদ্ধা ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন। এমনি করে রানীকে দেবীর আসনে বসিয়ে নিজে দেবীর পূজারী সেজে দূর থেকে পূজাঞ্জলি অর্ঘ্য দিয়েছেন। কবি তার মনোরাজ্যের দেবীর প্রসাদ লাভই তার লক্ষ্য। কবির প্রার্থনা–

আমি তব দ্বারে প্রেম ভিখারী
নয়নের অনুরাগে দৃষ্টির সাথে চাহি নয়নবারি।
আমি ফুলের মধু চাই, ছিঁড়ি না ফুল গো
দূর হতে গাহি গান বন বুলবুল গো
তব মনোবনে আছে নন্দন পারিজাত
আমি তারি পূজারী।

www.nagorikpathagar.org

প্রিয়ার হৃদয় নিবেদনের মাধুর্য্যে নিবেদিত। হৃদয় সরসীর প্রেম অঞ্জলি দিয়েছিলেন কবিকে দেবতা জ্ঞানে তার পদপমে। এখানে কবি প্রেমের দেবতা আর কবি প্রিয়া পূজারী। উপমা মিলে কবির লেখা সঙ্গীতে–

পূজার থালায় আছে আমার ব্যথার শতদল
হে দেবতা- রাখো এসে তোমার পদতল।
নিবেদনের কুসুম সহ
লহ, এসে আমায় লহ
সে আগুনে আমায় দহ
সেই আগুনে আরতি দ্বীপ জ্বেলেছি উজ্জ্বল।

অন্যত্র দেখা যায় পূজ্য-পূজারী সম্পর্কে কবি ও কবি প্রিয়া পরিচিত হয়েছেন। কবির কথায়–

ওগো দেবতা তোমার পায়ে
গিয়াছিনু ফুল দিতে।
মোর মন চুরি করে নিলে
কেন তুমি অলখিতে।

আমি হাতে আনি ফুলভরি
তুমি কেন চাহ আঁখি বারি
আমি পূজা অঞ্জলি আনি
তুমি কেন চাহ মালা নিতে।

অন্যত্র কবিকে রাজার ভূমিকায় দেখা যায় আর রানীকে দেখতে পাই পূজারিণী রূপে–

হে বসন্তের রাজা আমার
লও এসে মোর হার মানাহার।

সুরে ও রানীর মালা নিয়ে আমারে ছুঁইয়াছিলে

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৯২১ সালের ৮ই জুন দৌলতপুরের ঠিকানায় কবিকে লিখলেন–

ভাই নুরু, যাকে পেয়েছিস তিনিই যে তোর চির জনমের হারানো লক্ষ্মী। এ কথা সত্যি যদি এতটুকু সত্য হয়, তাহলে তোর সৌভাগ্যে আমার সত্যি

www.nagorikpathagar.org

ঈর্ষা হচ্ছে। লিখেছিস, এক অচেনা পল্লী বালিকার কাছে এত বিব্রত আর অসাবধান হয়ে পড়েছি, যা কোনো নারীর কাছে কখনো হইনি।

বলার অপেক্ষা রাখে না, পবিত্র বাবু কবির দৌলতপুরের প্রেম প্রণয় ও পরিণয় সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেন, যা অন্য কোন বন্ধুকে এমন করে জানান নাই। পবিত্র বাবুর পত্র মর্মে জানা যায়, কলকাতার ইচড়েপাকা কবি অচেনা পল্লী বালিকার নিকট সত্যি অসাবধান ও বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তীতে কবির হৃদয়ঘটিত এ আখ্যানের সর্বত্র কবির পরাজয় ও হৃদয়হীনের পরিচয় পাওয়া যায়। এ পরাজয় কবির মর্মদহনের কারণ। এ রকম দহন থেকে কবির অনুভূতি ধারাল হয়।

প্রিয়া কবির বেদনা সরস্বতী। এ সরস্বতীর পরশ কবিকে কাঁদায়, হাসায়, লেখায় ও গাওয়ায়। সুর ও বাণীর মালা নিয়ে কবির বেদনা সরস্বতী কবিকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। কোথাও ফুটে উঠেছে কবির প্রকাশ দৃপ্ত গর্ব ও অহঙ্কার। কোথাও কবি অসহায় ভিখারীর ক্ষীণ বুকফাটা আর্তনাদ। প্রিয়ার প্রেমের উত্তাপই কবির বাণী ও সুরের প্রকাশ অনিবার্য্য করে তুলেছিল।

কবির হৃদয়ে তার বেদনা সরস্বতীর অধিষ্ঠান। যেদিন দৈবৎ এ সরস্বতীর অধিষ্ঠান খাটে না। সেদিন রাধিকাবিহীন বৃন্দাবনের ন্যায় কবির হৃদয় শূন্য হয়ে পড়ে। কবির হৃদয়ে রানী ও সুরের প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যায়। কবির হৃদয় বীণা সুরহীন হয়ে পড়ে। কবির ভাষায়–

হাতখানি যবে রাখো মোর হাতের পরে
মোর কণ্ঠ হতে সুরের গঙ্গা ঝরে।
যেদিন তোমায় পাই না কাছে গো, পরশন নাহি পাই
মনে হয় যেন বিশ্ব ভুবনে কেহ নাই কিছু নাই
অভিমানে কাঁদে বক্ষে সেদিন বীণ
আকাশ যেদিন হয়ে যায় বাণীহীন
যেন রাধা নাই আর বৃন্দাবনে গো
সব সাধ যায় মরে।

অনেক কথা বলার মাঝে একটি কথা আজো বলা হয় নাই। সেই কথাটি কবি বলতে ব্যাকুল। সেই কথাটি ঢেকে রাখতে কবির চোখে জল ভরে যায়। সেই কথাটি কবি রাতের স্বপনে প্রিয়ার কানে কানে বলতে চান। সে কথা শুনে প্রিয়া লজ্জা রাঙ্গা হয়ে উঠবেন। প্রিয়াও সে কথা কোনো দিন প্রকাশ করবেন না। কবির ভাষায়–

www.nagorikpathagar.org

অনেক কথা বলার মাঝে
লুকিয়ে আছে একটি কথা
বলতে নারি সেই কথাটি
তাই এ মুখর ব্যাকুলতা।
সেই কথাটি ঢাকার ছলে
অনেক কথা যাই গো বলে
ভাসি আমি নয়ন জলে
বলতে গিয়ে সেই বারতা।
অবকাশ দেবে কবে, কবে সাহস পাব প্রাণে
লজ্জা ভুলে সেই কথাটি বলব তোমার কানে কানে
হে উদাসীন সঙ্গোপনে
বলবো তোমায় রাতের স্বপনে
নীরবে যেমন শোনায় বনে
মনের ব্যথা তার পুষ্পলতা।

কবির হৃদয় কোরকে পাতায় মোড়ানো কথার কলিরা সহসা দখিনা হাওয়ার পরশে হর্ষোৎফুল্য হয়ে ফুটে উঠে। কথার মুকুলগুলো সুরের সুতায় গেঁথে কার যে গলায় পরিয়ে দিতে চায় কবি, তা নিজেই জানেন না। কবির না দেখা প্রিয়া কোনো নিশিতে রাত জেগে কবির গান শোনেন। তার চোখের চাওয়ায় কবির নয়নে আবেশে নেমে আসে। গানের ভাষায়–

আজকে গানের বান এসেছে আমার মনে
যাক না নিশি গানে, গানে জাগরণে
মন ছিল মোর পাতায় ছাওয়া
হঠাৎ এলো দখিন হাওয়া
পাতার কোলে কথার কুঁড়ি
ফুটলো অধীর হরষণে।
সেই কথারই মুকুলগুলো
সুরের সুতায় গেঁথে গেঁথে
কারে যেন চাই পরাতে
কাহারে চাই কাছে পেতে।
জানি না সে কোন বিজনে
নিশিথ জেগে এ গান শোনে
না দেখা তার চোখের চাওয়ায়
আবেশ জাগার মোর নয়নে।

www.nagorikpathagar.org

কবি তার কথার ফুল আর গানের মাল আকাশে উড়িয়ে দিতে চান। যাতে কবি প্রিয়া কুড়িয়ে নিতে পারেন। কবির গানের ইন্দ্রধনুতে তার তনুর ক্ষণিক প্রতিভাস ফুটে উঠবে- তা প্রিয়ার অমৃত তুল্য। কবির আঁখিজল প্রিয়া নাইবা দেখুক। তার সুরের টলমল অশ্রুভার দেখতে পাবেন। কবির হৃদয় সরসীতে যে পদ্ম ফোটে। তাকে ঘিরে যে কথার ভ্রমর কাঁদে। সেই ভ্রমরের কাছে প্রিয়া কবির কথার মধু পান করবেন। গানের ভাষায়–

আকাশে আজ ছড়িয়ে দিলাম প্রিয়
আমার কথার ফুল গো
আমার গানের মালা গো কুড়িয়ে তুমি নিয়ো।

আমার গানের ইন্দ্র ধনু
রচে আমার ক্ষণিক তনু
জড়িয়ে আছে সেই অঙ্গে মোর
অনুরাগ অমীয়।

আমার- আঁখির পাতায় নাই দেখিলে
আমার আঁখি জল
আমার- কণ্ঠের সুর অশ্রুভারে
করে টলমল।

আমার হৃদয়ে পদ্ম ঘিরে
কথার ভ্রমর কেঁদে ফিরে
সেই ভ্রমরের কাছে আমার
মনের মধু পিও।

প্রিয়ার বেতার গীতি কবির হৃদয় যন্ত্রে বেজে ওঠে। সে ছন্দ সে সুর কবির কণ্ঠহার। ছন্দ ও সুরে প্রিয়ার যে আবেদন- কবি তা বোঝেন। উদাস হাওয়া গোপন কথার ফুল ফুটিয়ে যায়। কবি সে ফুলের মালা বক্ষে চেপে রাখেন হয়তো প্রিয়ার ফুলের কাঁটা কবির বুকে জ্বালা ধরবে। সেই আগুনে কবি অন্ধকারে প্রেম শিখা জ্বালিয়ে যাবেন। কবির ভাষায়–

তোমার বিনা তারের গীতি
বাজে আমার বীণা তারে
রইল তোমার ছন্দ গাঁথা
গাঁথা আমার কণ্ঠাহারে।

www.nagorikpathagar.org

মোর প্রথম মনের মুকুল

প্রথম প্রিয়ার প্রথম ভালোবাসায় কবি ধন্য। কিশোরী হৃদয়ের সব রাগ অনুরাগে প্রেম ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছিল কবি। সেই ছিল কবির পরম পাওয়া। ফনি হতে মণি তুলে নিয়েছেন কবি। একি কম পাওয়া! এ পরম প্রকাশ ঘটেছে কবির পূজারিণীতে—

বিদায়ের বেলা মোর ক্ষণে ক্ষণে উঠে বুকে আনন্দাশ্রু ভরি
কত সুখী আমি আজ সেই কথা স্মরি।
আমি না বাসিতে ভালো তুমি আগে বেসেছিলে ভালো
কুমারী বুকের তব সব স্নিগ্ধ রাগরাঙ্গা আলো
প্রথম পড়িয়াছিল মোর বুকে মুখে।

প্রিয়ার প্রথম প্রেমে কবি জনম ধন্য ও তৃপ্ত। তেমনি প্রথম প্রিয়াকে প্রথম ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছিলেন কবিও। দেয়া নেয়া উভয়ের সমান বলা চলে। এ সত্য প্রকাশ পেয়েছে কবির কবিতায়—

সব আগে আমি আসি
তোমারে চাহিয়া জেগেছি নিশীথ গিয়াছি ভালোবাসি
তোমার পাতায় লিখিলাম আমি প্রথম প্রণয় লেখা
এইটুকু মোর সান্ত্বনা- হোক বা না হোক দেখা।

প্রথম প্রিয়ার সহিত প্রথম বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন কবি। এ বিয়ের পিঁড়িতে কবির হিয়াখানিও প্রথম বিকিকিনি হয়েছিল। আর এ হিয়ার প্রথম ক্রেতাও প্রথম প্রিয়া। সেদিন এ কিশোরী লাজরাঙ্গা বধূ সেজে আনত নয়না বনলতার ন্যায় মাথানত করে ছিলেন। এ বিমুগ্ধ অভিজ্ঞতা শতবর্ষ পূর্বের কবি ও কবির প্রিয়ার সুখ স্মৃতি স্মরণে আনে—

সব গেনু ভুলে
বিনা মূলে
সব সাধনার হিয়াখানি মর্ম
বিকানু তোমার কাছে ওগো প্রিয়তম
লাজ মৌনা তুমি
মাথানত করে ছিলে বনলতা চুমি।

www.nagorikpathagar.org

প্রিয়ার দুর্লভ প্রেম কবির জীবনে পয়মন্ত হয়েছিল। প্রিয়ার প্রেমাঘাত কবির বিরহ সাগরে ব্যথাদীর্ন নীল কমল হয়ে ফুটে উঠেছিল, যা কবির গর্ব ও অহঙ্কারের প্রতীকী প্রকাশ।

অনাঘ্রাতা কিশোরীর ভরাট দেহ কবিতার ব্যঞ্জনায় মূর্তময়তা লাভ করেছিল। সেই কিশোরীর গোপন কোরকে পাতায় মোড়ানো অস্পর্শা কৌমার্য্য উন্মোচিত হয়েছিল। কোন লাজ ও ভয় কুমারিত্বের গুপ্তধন অনিরুদ্ধ রাখতে পারে নাই বরং মহাত্ম্য ও গৌরবে কবির নিকট প্রথম ক্ষণিক অবারিত হয়ে উঠেছিল। বিবাহ বন্ধনের এটাই সাবলীল ও স্ব-ধর্ম। কবির ভাষায়–

তেয়াগিয়া বালিকার শরম ভরম সব লাজ
খুলে দিলে হৃদয়ের চিররুদ্ধ দ্বার সবে আজ
সংকোচের নিষ্ঠুরতা দলি পায়
আত্মো প্রকাশিলে এসে দীপ্ত গরিমায়।
(অবেলায়)

পাওয়া না পাওয়ার তৃষ্ণা জাগানিয়া অশ্রুমতি, চিরশুদ্ধা, তাপস কুমারী প্রিয়াকে কবি জীবনের সর্বোত্তম প্রেমাঞ্জলি উৎসর্গ করেছিলেন। গোমতীর কূলে পাতায় মোড়ানো কবির বেদনা সরস্বতীকে কবি ভুলতে পারেন না। তাই অনন্ত বিরহের মাঝে খুঁজে ফিরেছেন। কুড়িয়ে পাওয়া ক্ষণে হারিয়ে যাওয়া হারামানিকে খুঁজছেন কবি। অনুশোচনীয় নীলকণ্ঠ কবি সকরুণ সুরে সে কথা স্মরণ করেছেন–

মোর প্রথম মনের মুকুল
ঝরে গেল হায় মিলনের ক্ষণে
কপোতীর মিনতি কপোত শোনিল না
উড়ে গেল গহন বনে।
দারুণ তিয়াসে এসে সাগর মুখে
ঢালিয়া পড়িল হায়, বালুকার বুকে
ধোয়ারে মেঘ ভাবি ভুলিল চাকতী
জ্বালিয়া মরি গো বিরহ দহনে।
কবির প্রথম প্রেমের পরিণতির স্বীকৃতি মিলে।
মোর গানের পাপিয়া ঝরে
আমি কি করিব, কহিলাম আঁখি নীড়ে
কহিলে কাঁদিবে মোর নাম নিয়ে বিরহ যমুনা তীরে।
(চির জনমের প্রিয়া)

www.nagorikpathagar.org

বিরহ যমুনার দুটি তীর। এক তীরে বিরহ ব্যাকুল কবি। অন্য তীরে বিরহ বিধুরা কবি বধূ, কিশোরী বধূ প্রিয়া। দুজন দুই তীরে মাঝে বহে বিরহ বাতাস। কবির ভাষায়–

আমাদের মাঝে বধূ বিরহ বাতাস
চিরদিন ফেলে যাবে দীর্ঘশ্বাস

একা তীরে কবির বিরহ আহত আর্তচিৎকার। অসহায় এক পুরুষের মর্মান্তিক গোঙামী হা-হুতাশ। অন্য তীরে বিরহ উতল করি প্রিয়ার উৎকর্ণ অপেক্ষা। দুজন দুই তীরে। কবির ভাষায়–

এই বুঝি হায় বিধির লিখন
দুই কুলে থাকি কাঁদিব দুজন
রাতের চখাচখীসম।

কবির ফিরে আসার সব প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ। প্রিয়ার প্রত্যয় জন্মে যে তার কবি আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। এ ছেঁড়া তার আর জোড়ানো সম্ভব নয়। চিরদিনের জন্য ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল নিষ্ঠুর ব্যাধের তীরে। ফিরিয়া আসিবে না আর মহুয়া বনের পাখি। বধূ প্রিয়ার সেকি আর্ত-উন্মাদ ব্যাকুলতা। স্ব-খেদে প্রিয়া ব্যাকুল আকুল আবাহন জানায় তার পালিয়ে যাওয়া প্রাণারামের উদ্দেশে। কবির সঙ্গীতের ভাষায়–

মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে বিদায় সন্ধ্যাবেলা
আমি দাঁড়ায়ে রহিনু এপাড়ে তুমি ওপাড়ে ভাসালে ভেলা।
সেই সে বিদায়ক্ষণে
শপথ করিলে বন্ধু আমার রাখিবে আমায় মনে
ফিরিয়া আসিবে খেলিবে আবার সেই পুরাতন খেলা।
আজও আসিলে না হায়
মোর অশ্রুর লিপি বনের বিহগীদিকে লয়ে যায়
তোমারে খুঁজে না পায়
মোর গানের পাপিয়া ঝরে
গহন-কাননে তব নাম লয়ে আজও পিয়া পিয়া সুরে
গান থেমে যায় ফিরে আসে পাখি বুকে বিঁধে অবহেলা।

www.nagorikpathagar.org

কেউ জানে না। প্রিয়াও জানেন না। জানেন কেবল কবি। প্রথম মিলন মালা ছিঁড়লো যখন, তখন থেকেই কবি ধরে নেন তিনি প্রিয়ার জীবনে নষ্টগ্রহ, অপয়া। প্রিয়ার জীবনাকাশে কবি কলঙ্কী চাঁদ। সে কলঙ্কের ছাপ যাতে প্রিয়ার গায়ে না লাগে, সে জন্য কবি প্রিয়াকে দূর হতে ভালোবেসে যেতে চান। কাছে পেতে চান না। হাত বাড়ালে যাকে অনায়াসে বুকে পাওয়া যেত। ভীরুতা আর শোচনায় সেই হাতটুকু তিনি বাড়ান নাই। অঙ্গারসম পুড়েছেন কবি। প্রিয়াকে পুড়তে দেন নাই। কবির অসহায়ত্ব ঝড়ে পড়েছে তার সঙ্গীতের ভাষায়–

তোমার আকাশে এসেছিনু হায়
আমি কলঙ্কী চাঁদ।
দূর হতে শুধু ভালো বেসেছিনু
সে তো নহে অপরাধ।
তুমি তো জানিতে আমার হিয়ার তলে
কোনো সে বেদনা কলঙ্ক হয়ে দোলে।
মোর জোসনায় ডুবে গেল তাই
তোমার মনের বাঁধ।
কলঙ্ক মোর দেখেছে সবাই
তুমি দেখেছিলে আলো
মোর কলঙ্ক গৌরব মানি
তাই বেসেছিলে ভালো।
অঙ্গে তোমার মোর ছাপ লাগে পাছে
ভালোবেসে তাই তোমারে চাহিনী কাছে।
অঙ্গারসম জ্বলে আজও প্রাণে
অপূর্ণ মোর সাধ।

যতই কলঙ্কী চাঁদ হোক, হোক না নষ্ট গ্রহ। প্রিয়ার জীবনে কবি প্রথম পুরুষ, প্রথম স্বামী। ধর্মত কবির পায়ের তলায় প্রিয়ার বেহেশত। কবি যতই অবহেলা হানুক, যতই আঘাত দিক তবুও প্রিয়া কবির চরণে আসবে কবির চরণ সাধবে। প্রিয়ার বিশ্বাস এ জগতে না হোক পর জগতে কবিকে প্রিয়া বুকে পাবেন। সেই প্রত্যয়ে ইহ জগতে কাছে পেতে আশা করেন না প্রিয়া। দূর থেকে ভালোবেসে যাবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। প্রিয়ার মতান্তর প্রকাশ পেয়েছে কবির সঙ্গীতে–

www.nagorikpathagar.org

জনম, জনম তব তরে কাঁদিব
যতই হানিবে হেলা ততই সাধিব।
তোমারি নাহি গাহি
তোমারি প্রেম চাহি
ফিরে ফিরে নিতি তব চরণে আসিব।
জানি জানি বধূ চাহে সে তোমারে
ভাসে সে চিরদিন নিরাশা পাথারে
তবু জানি, হে স্বামী
কোন সে লোকে আমি
তোমারে পাব বুকে বাহুতে বাঁধিব।

প্রেম যমুনার দুই তীরে এমনি করে তন্মাত্র সৃষ্টির তাবত প্রেমিক আত্মা। এক তীরে নর অন্য তীরে নারী। এক তীরে মানব আর অন্য তীরে মানবী। এক তীরে আদম অন্য তীরে ইভ। তারা সকলেই উৎকর্ণ। দেহ ও মনের সীমানা ছাড়িয়ে মহা প্রেমিকের মহামিলন আকাঙ্ক্ষায় সবাই উন্মুখ। কখন যে তাদের পথ চাওয়ার সমাপ্তি ঘটবে? কখন যে মিলনের শঙ্ক বাজবে, কে জানে?

কবির প্রত্যাশা, প্রাপ্তি, বিদ্রোহ ও অহঙ্কার

কিশোরী বধূর প্রেমে কবির প্রত্যাশা ছিল অপরিসীম। কবির প্রত্যাশা দেখতে পাই তার পূজারিণী কবিতায়। পূজারিণীতে মূলত দৌলতপুরের ঘটনাপুঞ্জির আভাস মিলে। কবির প্রত্যাশার বিশালত্ব ও পূজারিণীতে পরিস্ফুট। গ্রাম্য কিশোরী তার স্বভাবসুলভ চপলতায় কবির প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম না হওয়ারই কথা। অথবা পরস্পর ভুল বোঝাবুঝিও ঘটতে পারে, যা প্রায়শ হয়ে থাকে। দশটা সাধারণ মানস হতে কবি মানস ব্যতিক্রম। কবির চাওয়াটাও কবি মানস প্রকৃতির। অকবি মানস তা পূরণে ব্যর্থ হওয়া স্বাভাবিক। কবির প্রত্যাশার পরিধি পরিমাপ করা যাক–

এসেছিনু তব কাছে, জীবনের শেষ চাওয়া চেয়েছিনু তোমা
প্রাণের সকল আশা, সব প্রেম ভালোবাসা দিয়া
তোমারে পূজিয়াছিনু, ওগো মোর বেদরদী প্রিয়া
ভেবেছিনু বিশ্ব যারে পারে নাই, তুমি নিবে তার ভার হেসে
বিশ্ব বিদ্রোহীরে তুমি করিবে শাসন
অবহেলে শুধু ভালোবেসে।
ভেবেছিনু দুর্বিনীত দুর্জয়ীরে জয়ের গরবে

www.nagorikpathagar.org

তব প্রাণে উদ্ভাবিবে অপরূপ জ্যোতি, তারপর একদিন
তুমি মোর এ বাহুতে মহাশক্তি সঞ্চারিয়া
বিদ্রোহীর জয়লক্ষ্মী হবে।

দুরন্ত প্রত্যাশা। চাওয়ার বহর অপরিসীম। এ প্রচণ্ড প্রত্যাশা পূরণ না হওয়া স্বাভাবিক। বোধকরি চাওয়া ও পাওয়ার ব্যবধান এ ট্র্যাজেডি ঘটবার মূল কারণ। অর্বাচীনা কিশোরী বধূর অভিমান, অবহেলাসুলভ আচরণ কবির উপলব্ধি বিপরীতমুখী মোড় নিয়েছিল। কবির ভাষায়–

এ তুমি আজ, সে তুমি নহ
আজ হেরি তুমিও ছলনাময়ী
তুমিও হইতে চাও মিথ্যা দিয়ে জয়ী
কিছু মোরে দিতে চাও, অন্যতরে রাখ কিছু ঢাকি।
মনে হয় কোথা সেই পূজারিণী
কোথা সেই রিক্তা সন্ন্যাসিনী
এ যে সেই চির পরিচিত অবহেলা
এ যে সেই চির ভাবলেশহীন মুখ
পূর্ণানয় এ যে সেই প্রাণ নিয়ে ফাঁকি ফাঁকি
অপমানে ফেটে যায় বুক।
(পূজারিণী)

উপরোক্ত অভিজ্ঞতায় কবির হৃদয় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। উত্তাল তরঙ্গ সংকুল কবির বিশাল প্রেম সমুদ্র। অনন্ত তৃষ্ণাতুর অগস্তার ন্যায় কবির দুর্বিনীত আত্মোঅহম বিক্ষোভে ফেটে ফুঁসে উঠে। কবির এ বিক্ষোভের নমুনা মিলে তার প্রকাশ ভঙ্গিমায়–

যদি তাই হয়, ওরে মায়াবিনী
ওরে দুষ্ট তাই সত্য হোক
জ্বালো তবে ভালো করে জ্বালো মিথ্যালোক
তুমি, আমি, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহতারা
সব মিথ্যা হোক
জ্বালো তবে মিথ্যাময়ী, জ্বালো তবে ভালো করে
জ্বালো মিথ্যা লোক।
(পূজারিণী)

www.nagorikpathagar.org

শুধু বিক্ষোভ প্রকাশ করেই দুর্বিনীত কবি শান্ত হতে নারাজ। অসত্যের অসুন্দরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই কবির স্বভাব ধর্ম। যেখানে মিথ্যা, যেখানে অন্যায় সেখানেই কবির বিদ্রোহ স্ব-মূর্ত। তা সে হোক ঘরে কিংবা বাইরে। প্রথমে কবি ঘরে থেকেই বিদ্রোহ বাণী ঘোষণা করলেন–

শেষবার ঘিরে আসে, সাথী মোর মৃত্যুক্ষণ আঁখি
রিক্ত প্রাণ তিক্ত মুখে হু-করিয়া ওঠে তাই।
কার তরে তরে মন আর কেন পথে পথে কাঁদি
জ্বলে উঠ এইবার মহাকালী ভৈরবের নেত্র জ্বালাসম ধবক ধবক
হাহাকারে করতালি বাজা, জ্বালা তোর বিদ্রোহের রক্ত শিখা অনন্ত পাবক।
আন তোর বহ্নিরথ, রাজা তোর সর্বনাশ ভেরী
হান তোর পরশু ত্রিশূল, ধ্বংশ কর এই মিথ্যাপুরী
রক্ত সুধা বিষ আন, মরণের ধর টিপে টুটি
এ মিথ্যা জগত তোর অভিশপ্ত জগদ্দল চাপে হোক কুটিকুটি।
(পূজারিণী)

প্রেম সত্য, বিরহ সত্য। প্রেমের প্রত্যাশা, বঞ্চনা, বেদনা চিরন্তন সৌন্দর্যময়। কাঁটাহীন কমল কিম্মতহীন। বেদনাহীন প্রেমও সার্থকতাহীন। কিশোরীর আনকোরা চপলতা সূলভ আচরণ, হতাদর, অবহেলা সত্ত্বেও তার প্রেম কবির সান্ত্বনার হাতছানি হয়ে কবিকে অহঙ্কৃত করেছিল। প্রেমের বেদনার মধ্যেও কবি লাভ করেছিলেন বিজয় মাল্য। পেয়েছিলেন এক অনন্ত মধুরের পরম পরশ। পেয়েছিলেন ভাববার যন্ত্রণা ও লেখবার দুরন্ত সাহস। প্রেম হাবিয়ার অন্তহীন হুতাশনের মধ্যেও পেয়েছিলেন প্রেমের মেঘলা সেঁদুর ছায়া। বেদনাশ্রুর মাঝেও পেয়েছিলেন সুখাশ্রুর। এ সুখাশ্রুর প্রকাশ মিলে কবির পূজারিণীতে–

বিদায়ের বেলা মোর ক্ষণে ক্ষণে উঠে বুকে আনন্দাশ্রু ভরি
কত সুখী আমি আজ-সেই কথা স্মরি।
আমি না বাসিতে ভালো, তুমি মোরে বেসেছিলে ভালো
কুমারী বুকের তবসম স্নিগ্ধ রাগরাঙ্গা আলো
প্রথম পড়িয়াছিল মোর বুকে মুখে
ভুখারীর ভাঙ্গা বুকে পুলকের রাঙ্গা বান ডেকে যায়
আজ সেই সুখে।
সেই প্রীতি সেই রাঙ্গা সুখ স্মৃতি স্মরি

www.nagorikpathagar.org

এ জীবন এ জনম ধন্য হলো আমি আজ তৃপ্ত হয়ে মরি।
না চাহিতে বেসেছিলে ভালো মোরে তুমি শুধু তুমি
সেই সুখে মৃত্যু কৃষ্ণ অধর ভরিয়া
আজ আমি শতবার করে তব প্রিয় নাম চুমি।
(পূজারিণী)

বিদ্রোহ বেদনা ও সান্ত্বনার মধ্যে কবির আত্মোপ্রত্যয় আরো দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। বেদনাসৃত কবি প্রেম বিরহের প্রতীক কাব্যের রূপায়িত করার প্রেরণা লাভ করেন। রচনা করে তোলেন কবি বেদনা সুনীল ব্যথাদীনে অশ্রুমালা। হৃদয়ের থাল থাল, চাপ চাপ জমাটবাঁধা রক্তঝরা অশ্রুকলিতে রচনা করেন নিজ জীবনগাথা ব্যথা কমল মহাকাব্য। কবির বিরহ দগ্ধ কবিতা, সঙ্গীতে ও সুর সে মহাকাব্যের একেকটি অধ্যায়। অধ্যায়গুলোর সম্মিলিত সমাহার মহাকাব্য নয় তো কি? মহাকাব্যের উপাদান কোনটি এখানে নেই? কবির অন্ত সলিলা বেদনা শাপেবর হয়ে ওঠে। কবি নিজেই তা স্বীকার করেছেন–

কণ্টক মুকুট শোভা দিয়াছ তাপস
অসংকোচে প্রকাশের দুরন্ত সাহস।
উদ্ধৃত উলঙ্গ দৃষ্টি- বাণী ক্ষুরধার
বাণী মোর শাপে তব হলো তরবার।
(দারিদ্র্য)

কবির প্রেম এক ব্যথদীর্ন নীলোৎপরন। অন্তর যমুনার অবিনশ্বর তাজমহল। বাণীও সুরের মর্মরের ছাউনিতে অত্যুজ্জ্বল। সম্রাট প্রিয়ার স্মৃতি তীর্থ তাজমহল হয়তো কালের ছোঁয়ায় নিস্প্রভ হবে একদিন। কিন্তু কবি প্রিয়ার প্রেমের এ মন্দির এ মহাকাব্য দিনে-দিনে আরো উজ্জ্বল হতে থাকবে প্রেমিকের হৃদয় মন্দিরে। যতদিন পদ্মা, মেঘনা আর গোমতী বহমান থাকবে, ততদিন এ প্রেমের বাণীও বীণা সুর ছড়াবে পাঠকের অন্তরে।

এ প্রেমে কবি হারিয়ে যাননি। এ প্রেমে কবি পলাতক কিংবা পরাজিত নহেন। নির্মোহ এ প্রেমে কবি সার্থক। এ প্রেমে কবি গর্বিত ও অহঙ্কৃত। এ প্রেম কবিকে পিছনে টানে নাই। বরং সৃষ্টি সুখের উল্লাসে সম্মুখে চলার প্রেরণা ও শক্তি জুগিয়েছে। সৃষ্টির সীমানায় সৃজনশীল এ প্রেম বিধাতার আশীর্বাদ।

কবি প্রেমের সীমানা এঁকেছেন। এভাবে প্রেমের অহঙ্কার ও গর্বের সীমানা তিনি অধিক করেছেন–

www.nagorikpathagar.org

- নাই বা পেলাম আমার গলায় তোমার গলার হার
  তোমায় আমি করবো সৃজন এ মোর অহঙ্কার।

- আমি দূরে ধেয়ান লোকে রচব তোমার স্তব
  রচব সুরধ্বনী তীরে
  আমার সুরের উর্ধ্বশীরে
  নিখিল কণ্ঠে দুলবে তুমি গানের কণ্ঠহার
- আমার গানের অশ্রু জলে
  আমার বাণী পদ্ম জলে
  দুলবে তুমি চিরন্তনী চির নবীনা।

- এই তো আমার চোখের জলে
  আমার গানের সুরের ছলে
  কাব্যে আমার আমার ভাষায় আমার বেদনায়
  নিত্যকালের প্রিয়া আমার তুমি ডাকছ ইশারায়।

- নাইবা দিলে ধরা আমার ধরার আঙ্গিনায়
  তোমার জিনে গেলাম সুরের স্বয়ংবর সভায়
  তোমার রূপে আমার ভুবন
    আলোয়, আলোয় হলো মগ্ন।
  কাজ কি জেনে- কাহার আশায় গাঁথছো ফুলহার
  আমি তোমার গাঁথছি মালা, এ মোর অহঙ্কার।

এমনি করে কবির সৃজন সীমা ছাড়িয়ে অসীমে, রূপকে ছাড়িয়ে অরূপে বিলীন হয়েছে। চিরজনমের কবি প্রিয়া স্থান, কাল ও পাত্রের সীমা অতিক্রম করে নন্দনের উর্বশীতে রূপান্তরিত হয়েছে। সে প্রিয়া ভালোবাসার ছলে কবিকে গান গাওয়ায়, চাঁদের মতো দূর থেকে দোল খাওয়ায়।

বিষম চাওয়া

কবি প্রিয়ার কাছে কবির চাওয়া অসীম। কামনা ভরা তারুণ্য নিয়ে তিনি চেয়েছিলেন কবি প্রিয়াকে। আজন্ম প্রেম ভালোবাসার কাঙাল ছিলেন কবি। তাই যেখানে প্রেম-ভালোবাসার পরশ পেতেন, তা পরিপূর্ণ করে পেতে চাইতেন। অসীম তৃষ্ণা ও বুভূক্ষা কাতর ছিল তার হৃদয়। তার প্রেম তৃষ্ণার পরিধি নিজেই এঁকেছেন এভাবে–

www.nagorikpathagar.org

আপনার ভালোবাসা
আপনি পিইতে চাহে, মিটাইতে আপনার আশা
অনন্ত অগস্তা তৃষ্ণাকূল বিশ্বমাগা যৌবন আমার
এক সিন্ধু শুষি বিন্দুসম মাসে সিন্ধু আর
ভগবান, ভগবান একি তৃষ্ণা অনন্ত অপর।

বাঃ কি দারুণ তৃষ্ণা। কবি প্রিয়াকেও হতে হবে তারও চেয়ে স্বেচ্ছাচারী দুরন্ত। কল্পনাবিলাসী কবি সে চিত্রও এঁকেছেন এভাবে–

মোর চেয়েও স্বেচ্ছাচারী দুরন্ত দুর্বার
কোথা গেলে তারে পাই
যার লাগি এতবড় বিশ্বে মোর, নাই শান্তি নাই।

কবির চাওয়ার তুলনায় হয়তো পাওয়া ছিল নগন্য। প্রিয়ার মানসিকতা অত পরিপক্ক ছিল না। বরং বালিকার প্রেমে ছিল উন্নাসিকতা। তাই এক টুকরা কালো মেঘের প্রতিচ্ছায়া ভর করেছিল কবির হতাশা নিবিড় হৃদয় আকাশে। পরবর্তী লেখাতে তাই হতাদর, অবহেলা, অপমান হিংসা ছলনা ও প্রতারক ইত্যাদি শব্দগুলো বড় মর্মস্পর্শী হয়ে বার বার আবর্তিত হতে দেখা যায়।

একতরফা চাওয়ায় প্রত্যাখ্যাত হন কবি। খুঁজে ফিরেন প্রত্যাশিত সুখ নীড়। দ্বার হতে দ্বারে, হৃদয় হতে হৃদয়ান্তরে হাতড়ে ফিরেন কবি। তার বিক্ষুব্ধ হৃদয় শান্ত হয় নাই। ঘুরে ফিরে তিনি লাভ করেন কমলে কাঁটা কবির যন্ত্রণা কেহ বোঝে না। এ হৃদয়াকুলতা প্রকাশ পায় কবির লেখনিতে–

এ আবেগ নিয়ে কোথা যাব
নিতে কে পারিবে মোরে
কে আমারে পারে আকুড়ি রাখিতে
দুখানি বাহুর ডোরে।
(মানসী)

সব বিচারে কবি ও কবি প্রিয়ার যোগসূত্র ছিল বিষম বৈকি। বিষম সম্পর্কে যা ঘটে থাকে, এখানেও তাই অনিবার্য হয়েছিল। তাতে ব্যতিক্রম কী?

www.nagorikpathagar.org

চাঁদের গায়ে কলঙ্ক

প্রিয়ার প্রেমে কবি কলঙ্ক আবিষ্কার করেন। বিক্ষুব্ধ মানসিকতা থেকে জন্ম নেয় সন্দেহ। উভয়ের মাঝে কবি তৃতীয় পক্ষ আবিষ্কার করেন। এ সন্দেহ তার দৃঢ়মূল হয়। প্রিয়ার বালিকা সুলভ আচরণ আভিজাত্য ও উন্নাসিকতা কবি মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঘটায়। কবির মনে প্রিয়ার প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী সন্দেহের সূত্রপাত ঘটায়। স্বার্থান্বেষী চক্রের কান কথায় তা আরো দৃঢ়মূল হয়। ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েন তিনি। পরবর্তী লেখায় তাই বক্রবান নিক্ষিপ্ত হতে দেখা যায়। পূজারিণী কবিতায় তিনি লেখেন–

* কিছু মোরে দিতে চাও
অন্য তরে রাখো কিছু ঢাকি

* ঘুমায়ে কাহারো বুকে অকারণে যদি বুক ব্যথা করে
মনে কর, মরিয়া গিয়াছে আপদ
আর কভু আসিবে না ফিরে।

অবহেলার ডাক কবিতায় এ মর্মে স্বীকৃতি আদায় করেছেন–
তাই মা আমার বুকের কপাট
খুলতে নাড়ল তার করাঘাত
এ মন তখন কেমন যেন বাসতো ভালো আর কাহারে।

প্রিয়ার প্রতি সন্দেহ ব্যাকুল হয়ে উঠে কবি হৃদয়। এ সন্দেহ প্রবণতা কূট-কটাক্ষ ফুটে উঠেছে কবির সমসাময়িক কবিতায়। এ সময় বিভিন্ন কবিতায় অভিশম্পাত বর্ষিত হতে দেখা যায়। যেমন–

তোমার সখার আসবে যেদিন এমনি কারাবন্দ
আমার মতন কেঁদে কেঁদে হয়তো হবে অন্ধ
বন্ধু তোমার হানবে হেলা
ভাঙবে তোমার সুখের খেলা
দীর্ঘবেলা কাটবে না আর
বইতে প্রাণের শান্ত এ ভার
মরণ সনে বুঝবে
বুঝবে সেদিন বুঝবে।
(অভিশাপ)

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ হতাদর

দৌলতপুর ও তৎপরবর্তী সময়ের লেখনিতে অনাদর অবহেলা অপমান ও অধিকার শব্দগুলো ঘুরে ফিরে আবর্তিত হতে দেখা যায়। এসব শব্দ প্রয়োগে কবি মনের নিদারুণ মর্মযাতনার প্রমাণ পাওয়া যায়। হৃদয় উৎস্বরিত এ মর্মদহন অব্যক্ত গোঙানির প্রকাশ পায়। এতে কবির এ মর্মান্তিক বেদনা বুঝতে কষ্ট হয় না। যেমনটি তিনি তার 'ব্যথা নিশীথ' কবিতায় লিখেছেন–

কেন কি কথা স্মরণে আজ
বুকে তার হতাদর বাজে
কোন ক্রন্দন হিয়া মাঝে
উঠে গুঞ্জরী ব্যর্থ তাতে
আর জল ভরে আখি পাতে।

কবি মনের চাপা বেদন অপমান, অভিমান আর্তনাদের ন্যায় ধ্বনিতে হয়েছে পূজারিণীতেও–

তব মুখ পানে চেয়ে আজ
বাজসম বাজে মর্ম লাজ
তব অনাদর, অবহেলা স্মরি
তারি সাথে স্মরি নির্লজ্জতা
আমি আজ প্রাণে মরি
মনে হয় ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠি মা বসুধা দ্বিধা হও
ঘৃণাহত মাটি মাখা ছেলেরে তোমার।

এ নির্লজ্জ মুখ দেখা আলো থেকে অন্ধকারে টেনে নাও। কিশোরী বধূর প্রেমে ঘাটতি ছিল না। কবি নিজে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন–

এত ভালোবাসা শেষে এত অবহেলা
কেমনে হানিতে পারো, রানী।

অভিমান অবহেলা নিচের পঙ্‌ক্তিমালায় পরিদৃষ্ট–
নিলে বুঝি এতদিনে, মিথ্যা দিয়ে মোরে জিনে
অপমানে ফাঁকি দিয়ে
করিতেছ মোর শ্বাসরোধ।

www.nagorikpathagar.org

একই কবিতার অন্যত্র ধ্বনিত হয়েছে, যা আরো হৃদয় বিদারক—

তারে নিয়ে একি গূঢ় অভিমান, কোন অধিকারে
নাম ধরে ডাকটুকু তাও হানে বেদনা তোমারে।

দৌলতপুর থেকে কুমিল্লায় গিয়েছিলেন কবি অপমানের জ্বালা বুকে নিয়ে। অপমানের বিরাটত্ব্য বর্ণনা করতে গিয়ে কবি সুহৃদরা কেউ কেউ মনে করেন, অমন অপমানে যে কোনো পুরুষ আত্মহত্যা করতে পারে। কবি বধূর দেয়া আঘাত অনাদর অবহেলা, অপমানের হলাহল কবি নিঃশেষে পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। হলাহলের পরিবর্তে তিনি অমৃত উদ্‌গিরণ করেছিলেন। সৃষ্টি সার্থক অমৃত সুধা। এ কথা সত্য যে, এরূপ নির্মম অপমান আঘাত না পেলে কবির সুধা লাঘবের উৎস মুখ খুলতো না। বাংলা সাহিত্যের পাঠকেরা সে সুধা পানে বঞ্চিত হতো। এদিক বিবেচনায় কবি প্রিয়ার প্রেমাঘাত শাপেবর হয়েছিল কবির জীবনে।

কবির নারীরা

মানসী আমার,
'মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম বলে ক্ষমা করোনি, তাই বুকের কাঁটা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলুম' কবির ব্যথার দান উপন্যাসের উৎসর্গপত্র এটি। রক্তে লেখা এ উৎসর্গপত্রে কবির বাল্যপ্রেমের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। বাল্যপ্রেমে মিলন হয় না বটে, বাল্যপ্রেম প্রতিটি জীবনে দাগ কেটে যায় গভীরভাবে। দগদগে ক্ষত সারা জীবন শুকায় না।

কবির নিজ গ্রাম চুরুলিয়ায় সম্ভবত এ মানসীর বাস ছিল। ব্যথার দান উপন্যাসের নায়িকা সহিদার মধ্যে কবির বাল্যপ্রিয়ার প্রতীকী প্রতিচ্ছায়া বলে অনেকে মনে করেন।

এ বিষয়ে ভিন্নমত শোনা যায়। কেউ মনে করেন খোঁপার কাঁটাটি একজন দারোগার কিশোরী কন্যার। কবিদের খেলার মাঠে রোজ এ কিশোরী দাঁড়িয়ে থাকতেন। একদিন কবির কজন বন্ধু বাজি ধরলো কে ঐ কিশোরীর খোঁপার কাঁটাটি খুলে আনতে পারবে। কবি পেরেছিলেন। তবে হিন্দুর অবিবাহিত কন্যার খোঁপা হতে কাঁটা খুলে আনার জন্য অনেক হইচই হয়েছিল।

সে কাঁটার সাথে বুকের চাপা ব্যথা নিয়ে কবি ৩৯ বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়েছিলেন। গোটা পল্টন জীবনে সেই কিশোরীর খোঁপার কাঁটা বুকে নিয়ে ফিরছিলেন কবি। যুদ্ধ প্রত্যাগত হয়েও সে কাঁটা বুকে রেখেছিলেন তিনি। পরে কলকাতায় কর্ম কোলাহলে এক সময় সেটি হারিয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

কবির জীবনে বেশ কজন নারীর আগমন ঘটেছিল। তাদের সহিত ঘটেছিল প্রেম ও প্রণয়। কারো সাথে পরিণয়ও হয়েছিল। এদের সান্নিধ্যে কবি হয়েছিলেন একদিকে প্রতারিত। অন্যদিকে অহঙ্কৃত। একদিকে হয়েছিলেন বেদনার্ত অন্যদিকে চমৎকৃত। এদের সান্নিধ্যে কবি নারী রহস্য ও নারী চরিত্র সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি অর্জন করতে পেরেছিলেন।

দুটি নিরিখে তিনি তার নারীদের চিনেছিলেন। একটি প্রেমময়ী রূপে। অন্যটি ছলনাময়ী রূপে। তার নারী চরিত্র চিত্রন একান্ত মৌলিক অত্যন্ত সঠিকভাবে তিনি তার নারীদের চরিত্র এঁকেছেন তার কবিতায় ও সঙ্গীতে।

কবির মৌন নীপনীড়ে কবির নারীরা এসেছিলেন, খেলেছিলেন আবার চলেও গিয়েছিলেন এক সময়। রেখে গিয়েছেন কবির বেদনা বিধুর হৃদয়ে হাহাকার। তাদের আগমন ও তিরোধান কবি তীক্ষ্মভাবে অবলোকন করেছিলেন। কবির হৃদয় কতখানি ভেঙেছিল, কতখানি পুড়েছিল সেদিক কারোই ভ্রুক্ষেপ ছিল না। কমল হয়ে তারা ফুটেছিল কবির সুবিশাল হৃদয় সরসীতে। আবার কাঁটা দিয়ে চলেও গিয়েছে নির্বিকারে। কবি তার নারীদের আশা যাওয়ার একটা সরস বর্ণনা দিয়েছেন তার কবিতায়–

কত এলো- কত গেল ফিরে
কেহ ভয়ে কেহবা বিস্ময়ে
ভাঙা বুকে কেহ
কেহ অশ্রু নীড়ে
কত এলো- কত গেল ফিরে।
(পূজারিণী)

কবি কি চান? তা তারা বুঝতে পারে না। তারা যা দেন তা কবির প্রত্যাশিত নয়। কবির চাওয়ার ও পাওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–

আমি যাচি পূর্ণ সমর্পণ
বুঝিতে পারে না তাহা পূরনারীগণ
তারা আসে হেসে
শেষে হাসি শেষে
কেঁদে তারা ফিরে যায়
আপনার গৃহছায়।
কি যে চাই বুঝে নাক কেহ
কেহ আনে প্রাণ মন, কেহ বা যৌবন ধন

www.nagorikpathagar.org

কেহ রূপ দেহ
গর্বিত ধনিকা আসে মদমত্ত আপনার ধনে
আমারে বাঁধিতে চাহে রূপ ফাঁদে যৌবনের বনে।
(পূজারিণী)

অন্যত্র কবি তার নারীদের আসা যাওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–

আজ কপট প্রাণের তূনধারী
ঐ আসল যত সুন্দরী
কারো পায়ে বুক ডলা খুন, কেউ বা আগুন
কেউ মানিনী চোখের জলে বুক ভাসে
তাদের প্রাণের বুক ফাটে তাও মুখ ফোটে না
বাণীর বীণা মোর পাশে।
(সৃষ্টি সুখের উল্লাসে)

মনে প্রাণে ভালোবেসে ছিলেন কবি তার নারীদের। নিঃশেষে হৃদয়ের সব রাগ অনুরাগ প্রেম ভালোবাসা উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন কবি তার নারীদের পদতলে। কবি তার উজাড় করা ভালোবাসার একটা পরিধি বর্ণনা করেছেন এভাবে–

যে পূজা পূজিনি আমি স্রষ্টা ভগবানে
তারে দিনু সেই পূজা, সেই প্রেম
তবুও সে যে প্রতারণা হানে।

নিঃস্বার্থ নিবেদনের পরিবর্তে কবি লাভ করেন অবহেলা, অনাদর, অপমান আর প্রতারণা। এতে কবির মর্মমূলে দৃঢ়প্রত্যয় জন্মে যে, নারী মাত্রই ছলনাময়ী ও মিথ্যাশ্রয়ী। রূপের ফাঁদে এরা পুরুষ শিকার করে। স্বার্থ চরিতার্থ করে এরা অবশেষে দলিত দ্রাক্ষার ন্যায় পুরুষ প্রবরকে দূরে ছুড়ে মারে। একবারও তাকায় না অসহায় পুরুষের মুখের পানে।

কবির আত্মপ্রত্যয়ে নিদারুণ ধস নামে। নারী প্রকৃতি, নারী চরিত্র ও নারী রহস্য কবির নিকট স্বচ্ছ হয়ে আসে। এক চরিতা থেকে দ্বিচারিতা, দ্বিচারিতা থেকে বহুচারিতায় অভ্যস্ত নারীদের দেখে কবির আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় হয় যে, প্রেম সত্য ও চিরন্তন বটে! প্রেমের পাত্র একটি মাত্র নয়। প্রেমের পাত্র অগণন ও অসংখ্য। দুনিয়ার সব চেয়ে বড় হেয়ালী নারীর মন। নারী তার সব দিতে পারে, কেবল দিতে পারে না তার গোপন মঞ্জুষার কুঞ্জিকাটি। ওটি তারা

www.nagorikpathagar.org

হাতছাড়া করতে চায় না। কবি তার উপার্জিত অভিজ্ঞান থেকে তার নারীদের চারিত্রিক স্বরূপ এঁকেছেন বড় নির্ভুলভাবে–

এরা দেবী, এরা লোভী, এরা চাহে সর্বজনপ্রীতি
ইহাদের তরে নহে প্রেমিকের পূর্ণ পূজা, পূজারীর পূর্ণ সমর্পণ
পূজা হেরি ইহাদের ভীরু বুকে তাই জাগে এত সত্য ভীতি
নারী নাহি হতে চায়- শুধু একা কারো
এরা দেবী, এরা লোভী, যত পূজা পায়, এরা তত চায় আরো
ইহাদের অতি লোভী মন
একজন তুষ্ট নয়, এক পেয়ে সুখী নয়
যাচে বহুজন।
(পূজারিণী)

কত প্রেমিকের হৃদয় অঞ্জলী ইহাদের পায় জমা হয়। শত প্রেমিক পূজা উপাচার ইহাদের পায় জমা হয়– হিসেব কে রাখে? এত পূজা এত যে আরাধনা আয়োজন রহস্যময়ী নারী সেদিকে তাকায় না। কেবল এক চিলতে অবজ্ঞার হাসি দিয়ে নির্বিকারে দলে যায়। প্রেমিক প্রবরের চাপ চাপ, থাল থাল অলক্তক রক্ত রঞ্জিত পথ ধরে নির্বিকারে এরা হেঁটে প্রবেশ করে অন্য প্রেমিকের হৃদয় মন্দিরে। কবি বিস্ময়ে তার নারীদের যাওয়া আসা দেখে ভাবেন, এত সুন্দর তনু দিয়ে গড়া নারী হৃদয় এত পাষাণ কেন?

সুন্দর তনু, সুন্দর মন-হৃদয় পাষাণ কেন?
সেই ভুলে যাওয়া অবহেলা, এলে সুন্দর রূপে হেন
নারী কি দেবতা? কেবলি তারা পাষাণ নির্বিকার
পদতলে তার পূজার অর্ঘ্যনীতি হয়ে ওঠে ভার
কত যে হৃদয় দলিয়া চরণে আলতা পরেছ রানী
ধরা নাহি দিলে তোমারে খুঁজিছে কত যে কবির বাণী
(সুন্দর অবহেলা)

কবির নারীদের মধ্যে কবি প্রিয়া নার্গিস আসার খানম কবিকে পুড়িয়েছেন এবং নিজেও পুড়েছেন। নার্গিসের প্রেম ও বিরহ কবির জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। কবির লেখনি তার প্রমাণ। নার্গিস ধেয়ানে কবির লেখা অনেক। কবির লেখনির প্রেরণাই নার্গিস। কবির জীবনে নার্গিস ছিল কবির আশীর্বাদ। অন্যদিকে কবি ছিলেন নার্গিস জীবনে কলঙ্কী চাঁদ 'এক অভিশাপ'।

www.nagorikpathagar.org

মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে

প্রতীক্ষায় ক্লান্ত প্রিয়া। জীবনের গুরুভার আর বইতে পারছেন না তিনি। একরাশ ক্লান্তি আর মর্ম যন্ত্রণা তাকে অবসন্ন করে তোলে। কি হবে আর প্রতীক্ষার ব্যর্থ প্রদীপ জালিয়ে রেখে? তার প্রতীক্ষার কি শেষ নেই? এ আঁখি জলের মূল্য কী? শাপভ্রষ্টা দেববালার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় এক সময়। আত্মীয় পরিজনের একান্ত চাপে অনিচ্ছায় অবশেষে দ্বিতীয় বিয়েতে সম্মতি প্রদান করেন তিনি।

সে মতে প্রথম বিয়ের বিচ্ছেদ বা তালাকনামা প্রয়োজন। প্রিয়ার পক্ষে মুরব্বিরা গেলেন কলকাতায়। সকলের উপস্থিতিতে তালাক নামায় স্বাক্ষর প্রদান করেন কবি। ১৯২১ হতে ১৯৩৭ কবি ও কবি প্রিয়ার যোগসূত্রটিও ছিন্ন হয়ে গেল।

বিয়ের দিন হতে তালাকনামায় স্বাক্ষর দান পর্যন্ত কবির ভূমিকা বিপরীতমুখী। বিয়ের পূর্বের কবি আর বিয়ের পরের কবির অনেক তফাৎ লক্ষণীয়। বিয়ের পূর্বের কবি এক প্রেম উন্মুখ ব্যাকুল তরুণ আর বিয়ের পরের কবি এক দায়িত্বহীন নির্বিকার অভিভাবক। বিয়ের পূর্বের কবির কনসাসনেসের বাহাদুরি অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে বিয়ের পর।

কবির লেখনি জগতে তার কাব্য কবিতায় সুরে-সঙ্গীতে আকুতি আরাধনার প্রকাশ মিলে, লেখনির বাইরে কবির নির্লিপ্ততার পরিচয় মিলে। কবি ও কবি প্রিয়ার ছেঁড়া তার যে কোনোদিন জোড়ানো যাবে না, তা কবি জানতেন। কবির হৃদয়ের দৃঢ়তার প্রকাশ পাওয়া যায় তার ঐতিহাসিক পত্রের ভাষায়–

আমি কখনো কোনো দূত প্রেরণ করি নাই তোমার কাছে। আমাদের মাঝে যে অসীম ব্যবধানের সৃষ্টি, তার সেতু কোনো লোক তো নয়ই 'স্বয়ং বিধাতাও হতে পারেন কিনা সন্দেহ'।

বিষফোড়ে নখের আঁচড়

তালাকনামায় সই স্বাক্ষর হওয়ার পর শুরু হলো বিয়ের আয়োজন। এবার বর হিসেবে এলেন পূর্বোক্ত আজিজুল হাকিম। বিয়ে পাকাপাকি হওয়ার পর তিনি গেলেন কলকাতায়। উদ্দেশ্য কবির অনুমতি ও আশীর্বাদ গ্রহণ।

পাকা বিষফোড়ায় ধারালো নখের আঁচড় যেন। তা সত্ত্বেও স্বাভাবিকভাবেই তিনি অনুমতি ও আশীর্বাদ প্রদান করলেন। মূলত এ অনুমতি ও আশীর্বাদ চেয়েছিলেন প্রিয়া নতুন বর আজিজুলের মাধ্যমে। পত্রের উত্তরে কবি তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন এভাবে–

'আমার অন্তর্যামী জানেন, আমার হৃদয়ে তোমার জন্য কি অসীম বেদনা। কিন্তু সে বেদনায় আমিই পুড়েছি, তা দিয়ে তোমাকে দগ্ধ করতে চাইনি।' শুধু

www.nagorikpathagar.org

কবি কি পুড়েছেন? প্রিয়া বুঝি পোড়েন নাই। কবির বৈদগ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে তার কাব্যে কবিতায়, সুরে সঙ্গীতে আর প্রিয়ার বৈদগ্ধতা প্রকাশ পায় তার ব্যথা সুন্দর আঁখি জলে।

প্রিয়ার পত্রের জবাবে কবি আরো লিখলেন–
'তোমাকে আমি পেয়েও হারালাম। তাই স্মরণে পাবো এ বিশ্বাস আর সান্ত্বনা নিয়ে বেঁচে থাকবো। প্রেমের ভুবনে তুমি বিজয়িনী, আমি পরাজিত, আমি অসহায়। বিশ্বাস করো আমি প্রতারণা করিনি। আমাদের মাঝে যারা দূরত্ব সৃষ্টি করেছে পরকালে তারা মুক্তি পাবে না। তোমার নবযাত্রা সফল হোক'।

কি চমৎকার কবির আত্ম স্বীকারোক্তি। পরিতাপ, অভিসম্পাৎ আর অভিনন্দনে আবেগনির্ভর। দূরত্ব সৃষ্টিকারীদের হাতে নিজের ভাগ্যের চাবিকাঠি তুলে দিয়ে অসহায়তার আবরণে কবি মুক্তির পথ খুঁজছেন। কবিতায় সঙ্গীতে ও পত্রের ভাষায় প্রিয়ার প্রতি যে সমবেদনার প্রকাশ পাওয়া যায়, বাস্তবে মিলে তার উল্টো। সাহিত্য সৃষ্টি স্বার্থে প্রিয়ার প্রতি যে বাণী নিক্ষেপিত ও নিবেদিত ব্যক্তিবলয়ে কর্মে ও আচরণে তা অনুপস্থিত।

গ্রাম্য বধূ প্রিয়া তার নিখাদ প্রেমের নৈবেদ্য নিয়ে সুদীর্ঘ কাল এমন কি আমৃত্যু কবির প্রতীক্ষারত বিধুর জীবনে অভ্যন্ত আভাস পাওয়া যায়। অন্যদিকে কবির হৃদয়হীন ও বৈষম্যমূলক আচরণ পাওয়া যায়।

সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনে প্রিয়ার প্রতি যে আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশ দেখে মুগ্ধ হতে হয়, ব্যক্তি বলয়ে সে আকুতি ও অনুভূতির একান্ত অনুপস্থিত। একটি জীবনে দুটি ধারা দুই রকম।

বেদনার জগদ্দল হৃদয়ে চেপে রেখে কবি স্বাভাবিকভাবে স্নেহ ধন্য আজিজুল হাকিমকে এ বিয়েতে উৎসাহিত করলেন ও অভিনন্দিত করলেন। সেই সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে প্রিয়ার উদ্দেশে একটি কবিতা লিখে তাকেও অভিনন্দিত করলেন। কবিতাটি নিম্নে দেয়া হলো–

পথ চলিতে যদি চকিতে
কভু দেখা হয়, পরাণ-প্রিয়
চাহিতে যেমন আগের দিনে
তেমনি মদির-চোখে চাহিও ॥

যদি গো সেদিন চোখে আসে জল,
লুকাতে সে-জল করিও না ছল,
যে-প্রিয় নামে ডাকিতে মোরে
সে-নাম ধ' রে বারেক ডাকিও ॥

www.nagorikpathagar.org

তোমার বঁধু যদি পাশে রয়,
মোর-ও প্রিয় সে, করিও না ভয়,
কহিব তা'রে, "আমার প্রিয়ারে
আমার অধিক ভালোবাসিও ॥"

বিরহ-বিধুর মোরে হেরিয়া,
ব্যথা যদি পাও, যাব সরিয়া,
র'ব না হ'য়ে পথের কাঁটা,
মাগিব এ বর-মোরে ভুলিও ॥
–নজরুল

এ কবিতার সাথে আর একটি দুই লাইনের কবিতা লিখে আজিজুল হাকিমের মাধ্যমে প্রিয়ার উদ্দেশে পাঠান কবি। দুই লাইনের কবিতাটি এরূপ–

যে আসিল আজ বাসরে তোমার মালা দাও তারি গলে
সে রহিবে তব বুকের মাঝে, আমি তব অন্তর তলে।

১৯৩৭ সালে আজিজুল হাকিমের সহিত প্রিয়ার দ্বিতীয় বিবাহ হয়। প্রিয়ার নতুন সংসারের উদ্দেশে বিদায় অভিনন্দন উৎসর্গ করেন কবি–

বিদায় সখী খেলা শেষের এই বেলা শেষের ক্ষণে
এখন তুমি নতুন মানুষ নতুন গৃহ কোণে।
(পিছু ডাক)

নির্বাক অশ্রু বিসর্জন

কবিকে এক নজর দেখার বড় সাধ জাগে প্রিয়ার। কিন্তু সে সুযোগ আর হয়ে ওঠে না। সহসা সে সুযোগ মিলে গেল নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। ঢাকা বেতারের বর্ষপূর্তি-১৯৪০ সাল। কলকাতা থেকে আমন্ত্রিত কবি এলেন ঢাকায়। স্বামী আজিজুল হাকিমের মাধ্যমে নিমন্ত্রণ করে বসলেন প্রিয়া তার বাংলাবাজার ভবনে। কবিও সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

অপূর্ণ মনের সাধ পূর্ণ হতে চলেছে। হৃদয় মূলের শোনিত ধারায় যার স্মৃতি রঞ্জিত সেই কবিকে আজ চাক্ষুষ দেখতে পাবেন প্রিয়া। এ কি কম কথা। দূরের চাঁদ আজ প্রিয়ার আঙিনায়। ব্যথার বাণীরা ঝঙ্কার তোলে প্রিয়ার হৃদয়ে–

হারিয়ে গেছো অন্ধকারে পাইনি খুঁজে আর
তোমার আমার মাঝে বধূ সপ্ত পারাবার।

www.nagorikpathagar.org

নানা ব্যঞ্জনায়, নানা উপাচারে সযত্নে স্বহস্তে রান্না করেন প্রিয়া। তার কবি আসবেন। কবির আগমনী পথ চেয়ে প্রতীক্ষায় বসে থাকেন তিনি। কবি এলেন স্বামী আজিজুল হাকিম সমভিহারে। কিন্তু এক কণা আহার্যও স্পর্শ করলেন না কবি। প্রিয়ার হাতের এক খিলি পান খেলেন মাত্র।

মুখোমুখি বসে থাকেন দুজনে। কারো মুখে কথা নেই। মাঝে সময়ের নদী বহমান। কেবলি নির্বাক অশ্রু বিসর্জন। চোখের জলে বুকের জমাট বাঁধা কথা অশ্রু হয়ে নীরবে ঝরে যায়। হৃদয়ে হৃদয়ে কথা হয়। বেদনার অনেক কথা। নির্বাক চেয়ে থাকার মাঝে কথাগুলো মুখরতা লাভ করে। অফুরন্ত কতো কথা। নীরবে অশ্রুমালা ব্যক্ত বাঙময় হয়–

বেদনার পদতলে পেতেছি আসন
হে দেবতা
হেথা আর কেহ নাই আমরা দুজন
কহিব কথা।

এসো বন্ধু মুখোমুখি বসি
অথবা টানিয়া লহ তরঙ্গের আলিঙ্গন দিয়া, দহ্ পশি
কেউ নাই সেথা- শুধু নিতল সুনীল
তিমিরে কহিয়া দাও- সে যেন খোলে না খিল
থাকে দ্বারে বসি
সেই খানে কব কথা- যেন রবি শশী
নাহি পাশে সেথা
তুমি রবে, আমি রব- আর রবে ব্যথা
সেথা শুধু ডুবে রব- কথা নাহি কহি
যদি কই
নাই সেথা দুটি কথা বই
আমিও বিরহী, বন্ধু- তুমিও বিরহী।
(সিন্ধু)

মা এখন এখানে তুমি শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকো

আজিজুল হাকিমের সহিত ঘরকন্নায় প্রিয়া সন্তান-সন্ততির জননী হন। তার বড় ছেলে ডাক্তার হয়ে আমেরিকায় চলে যান। ম্যানচেস্টারে বসবাস করতে থাকেন। আশির দশকে ছেলের আমন্ত্রণে তিনি ম্যানচেস্টারে চলে যান এবং সেখানে ছেলের সাথে থেকে যান। ১৯৮৫ সালের ২রা জুন তারিখে এ যুগ

www.nagorikpathagar.org

বিরহিণী সেখানেই দেহত্যাগ করেন এবং সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়। চিরায়ত বাংলার এ গ্রাম্য বিধুরা বধূ সুদূর পরবাসে আজ চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। তার করবের গায় উৎকর্ণ করা হয়–

'মা, এখন এখানে তুমি শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকো'

মা যে শান্তিতে ছিলেন না, মাতৃ দুঃখে সমব্যথী সন্তানেরা তা জানতেন। তাই কবর গায়ে উৎকীর্ণ করার এ আয়োজন।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

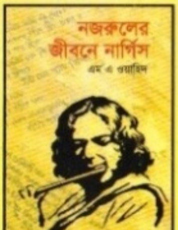

রিদম প্রকাশনা সংস্থা

Nazruler Jibone Nargis
By M A Waheed
Published by : Rhythm Prokashona Sangstha
E-mail : rythm.prokash@yahoo.com
Price : 200.00 Taka only. US $ 7

ISBN 9789849199595
9789849199595